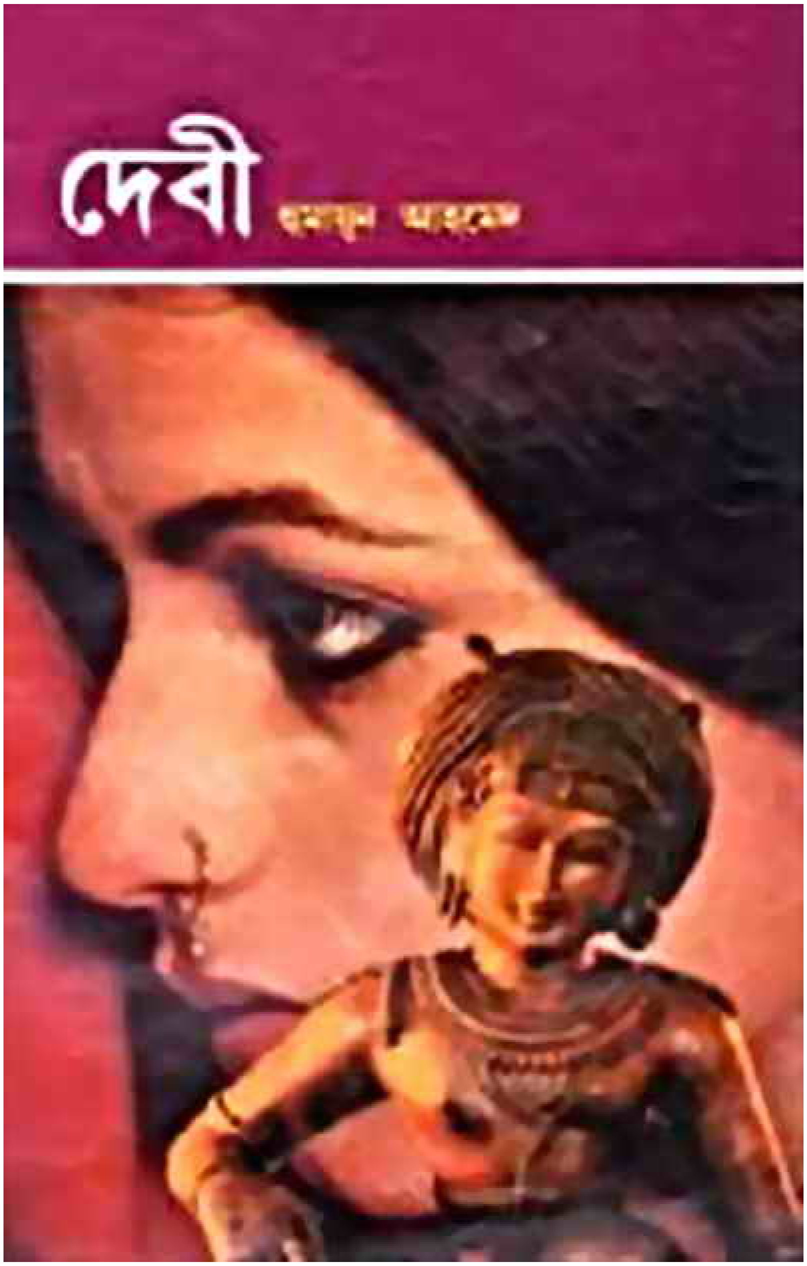
Debi by Humayun Ahmed

suman_ahm@yahoo.com


দেবী

১

মাঝরাতের দিকে রানুর ঘুম ভেঙে গেল।

তার মনে হলো ছাদে কে যেন হাঁটছে। সাধারণ মানুষের হাঁটা নয়, পা টেনে টেনে হাঁটা। সে ভয়ার্ত গলায় ডাকল, 'এই, এই।' আনিসের ঘুম ভাঙল না। বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। অল্প-অল্প বাতাস। বাতাসে জামগাছের পাতায় অদ্ভুত এক রকমের শব্দ উঠছে। রানু আবার ডাকল, 'এই, একটু ওঠ না। এই।'

'কী হয়েছে?'

'কে যেন ছাদে হাঁটছে।'

'কী যে বল! কে আবার ছাদে হাঁটবে? ঘুমাও তো।'

'প্লীজ, একটু উঠে বস। আমার বড় ভয় লাগছে।'

আনিস উঠে বসল। প্রবল বর্ষণ শুরু হলো এই সময়। ঝমঝম করে বৃষ্টি। জানালার পর্দা বাতাসে পতপত করে উড়তে লাগল। রানু হঠাৎ দেখল, জানালার শিক ধরে খালিগায়ে একটি রোগামতো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটির দুটি হাতই অসম্ভব লম্বা। রানু ফিসফিস করে বলল, 'ওখানে কে?'

'কোথায় কে?'

'ঐ যে জানালায়।'

'আহ্, কী যে ঝামেলা কর! নারকেল গাছের ছায়া পড়েছে।'

'একটু বাতিটা জ্বালাও না।'

'রানু, তুমি ঘুমোও তো।'

আনিস শোবার উপক্রম করতেই ছাদে বেশ কয়েক বার থপথপ শব্দ হলো। যেন কেউ-এক জন ছাদে লাফাচ্ছে।

রানু চমকে উঠে বলল, 'কিসের শব্দ হচ্ছে?'

'বানর। এ জায়গায় বানর আছে। কালই তো দেখলে ছাদে লাফালাফি করছিল।'

'আমার বড় ভয় করছে। একটু উঠে গিয়ে বাতি জ্বালাও না। পায়ে পড়ি তোমার।'

আনিস বাতি জ্বালাল। ঘড়িতে বাজে দেড়টা। ছাদে আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তবু রানুর ভয় কমল না। সে কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল। আনিস

বিরক্ত স্বরে বলল, 'এ রকম করছ কেন?'

'কেন জানি অন্য রকম লাগছে আমার। একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।'

'কী স্বপ্ন?'

'দেখলাম আমি যেন...'

কথার মাঝখানে হঠাৎ রানু থেমে গেল। কে যেন হাসছে। ভারি গলায় হাসছে। রানু কাঁপা স্বরে বলল, 'হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছ? কে যেন হাসছে।'

'কে আবার হাসবে! বানরের শব্দ। কিংবা কেউ হয়তো জেগে উঠেছে দোতলায়।'

আনিস লক্ষ্য করল, রানু খুব ঘামছে। চোখ-মুখ রক্তশূন্য। বালিশের নিচ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। দেশলাই জ্বালাতে-জ্বালাতে বলল, 'কী স্বপ্ন দেখছিলে?'

'দিনের বেলা বলব।'

'কী যে সব কুসংস্কার তোমাদের! এখনো ভয় লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'ভয়টা কিসের? চোর-ডাকাতের, না ভূতের?'

'বুঝতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, বাতি জ্বালানোই থাক। বাতি জ্বালিয়েই ঘুমাব আজকে। এখন বল দেখি, কী স্বপ্ন দেখলে?'

'দিনের বেলা বলব।'

'আহ্ বল না! বললেই ভয় কেটে যাবে।'

রানু আনিসের বাঁ হাত শক্ত করে চেপে ধরল। থেমে-থেমে বলল, 'দেখলাম, একটা ঘরে আমি শুয়ে আছি। একটা বেঁটে লোক এসে ঢুকল। তারপর দেখলাম, সে আমার শাড়ি টেনে খুলে ফেলার চেষ্টা করছে।'

আনিস শব্দ করে হাসল।

রানু বলল, 'হাসছ কেন?'

'হাসব না? এটা কি একটা ভয় পাওয়ার স্বপ্ন?'

'তুমি তো সবটা শোন নি।'

'সবটা শুনতে হবে না। পরে কী হবে তা আমার জানা। তুমি যা দেখেছ তা হচ্ছে একটা সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসি। যুবক-যুবতীরা এ রকম স্বপ্ন প্রায়ই দেখে।'

'আমি দেখি না।'

'তুমিও দেখ। মনে থাকে না তোমার।'

'আমি স্বপ্ন খুব কম দেখি। যা দেখি তা সব সময় সত্যি হয়। তোমাকে তো

বলেছি অনেক বার।'

আনিস চুপ করে রইল। রানু এই কথাটি প্রায়ই বলে। বিয়ের রাতে প্রথম বার বলেছিল। আনিস সেবারও হেসেছে। রানু অবাক হয়ে বলেছে, 'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না, না?'

'নাহ্।'

'আমি আপনার গা ছুঁয়ে বলছি, বিশ্বাস করুন আমার কথা।'

রানু এমনভাবে বলল, যেন আনিসের বিশ্বাসের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। আনিস শেষ পর্যন্ত হাসিমুখে বলল, 'ঠিক আছে বিশ্বাস করলাম, এখন দয়া করে আপনি-আপনি করবে না।' রানু ফিসফিস করে বলল, 'আপনার সঙ্গে যে আমার বিয়ে হবে, সেটাও আমি জানতাম।'

'এটাও স্বপ্নে দেখেছিলে?'

'হুঁ। দেখলাম, একটি লোক খালিগায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পেটের কাছে একটা মস্ত কাটা দাগ। লোকটিকে দেখেই মনে হলো, এর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। আমি তাকে বললাম, কেটেছে কীভাবে? আপনি বললেন, 'সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছিলাম।'

আনিস সে রাতে দীর্ঘক্ষণ কোনো কথা বলতে পারে নি। তার পেটে একটা কাটা দাগ সত্যি-সত্যি আছে, এই মেয়েটির সেটা জানার কথা নয়। তবে সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে কাটে নি। জামগাছ থেকে পিছলে পড়ে কেটেছে। ব্যাপারটা কাকতালীয়, বলাই বাহুল্য। মাঝে-মাঝে এমন দুই-একটা জিনিস খুব মিলে যায়। তবুও কোথায় যেন একটা ক্ষীণ অস্বস্তি থাকে।

বাইরে বৃষ্টি খুব বাড়ছে। ঝড়টড় হবে বোধহয়। শোঁ-শোঁ আওয়াজ হচ্ছে জানালায়। একটি কাঁচ ভাঙা। প্রচুর পানি আসছে ভাঙা জানালা দিয়ে, শীত-শীত করছে।

'রানু, চল ঘুমিয়ে পড়ি।'

'সিগারেট শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

বিছানায় ওঠামাত্র প্রবল শব্দে বিদ্যুৎ চমকাল। বাতি চলে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। শুধু এ অঞ্চল নয়, সমস্ত ঢাকাই বোধ করি অন্ধকার হয়ে গেল। আনিস বলল, 'ভয় লাগছে রানু?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, হাসির গল্পটল্প কর। এতে ভয় কমে যায়। বল একটা গল্প।'

'তুমি বল।'

আনিস দীর্ঘ সময় নিয়ে এক জন পাদ্রী ও তিনটি ইহুদি ও তিনটি মেয়ের গল্প বলল। গল্পের এক পর্যায়ে শ্রোতাকে জিজ্ঞেস করতে হয়—পাদ্রী তখন কী বলল? এর উত্তরটি হচ্ছে পাঞ্চ লাইন, কিন্তু কিচ্ছু জিজ্ঞেস করল না রানু। সে কি শুনছে না? আনিস ডাকল, 'এই রানু, এই!' রানু কথা বলল না। বাতাসের ঝাপটায় সশব্দে জানালার একটি পাল্লা খুলে গেল। আনিস বন্ধ করবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই রানু তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপা গলায় বলল, 'তুমি যেও না। খবরদার, যেও না!'

'কী আশ্চর্য, কেন?'

'একটা-কিছু জানালার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে।'

'কী যে বল!'

'প্লীজ, প্লীজ।'

রানু কেঁদে ফেলল। ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, 'তুমি গন্ধ পাচ্ছ না?'

'কিসের গন্ধ?'

'কর্পূরের গন্ধের মতো গন্ধ।'

এটা কি মনের ভুল? সূক্ষ্ম একটা গন্ধ যেন পাওয়া যাচ্ছে ঘরে। ঝন্‌ঝন্ করে আরেকটা কাঁচ ভাঙল। রানু বলল, 'ঐ জিনিসটা হাসছে। শুনতে পাচ্ছ না?' বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আনিস কিছু শুনতে পেল না।

'তুমি বস তো। আমি হারিকেন জ্বালাচ্ছি।'

'না, তুমি আমাকে ধরে বসে থাক।'

আনিস অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'তুমি ঐ জানালাটার দিকে আর তাকিও না তো!' আনিস লক্ষ্য করল, রানু থরথর করে কাঁপছে, ওর গায়ের উত্তাপও বাড়ছে। রানুকে সাহস দেবার জন্যে সে বলল, 'কোনো দোয়া-টোয়া পড়লে লাভ হবে? আয়াতুল কুর্সি জানি আমি। আয়াতুল কুর্সি পড়ব?'

রানু জবাব দিল না। তার চোখ বড়-বড় হয়ে উঠেছে। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে নাকি? শ্বাস ফেলছে টেনে-টেনে।

'এই রানু, এই।'

কোনোই সাড়া নেই। আনিস হারিকেন জ্বালাল। রান্নাঘর থেকে খুটখুট শব্দ আসছে। ইঁদুর, এতে সন্দেহ নেই। তবু কেন জানি ভালো লাগছে না। আনিস বারান্দায় এসে ডাকল, 'রহমান সাহেব, ও রহমান সাহেব।' রহমান সাহেব বোধহয় জেগেই ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেরুলেন।

'কী ব্যাপার?'

'আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

'কী হয়েছে?'

'বুঝতে পারছি না।'

'হাসপাতালে নিতে হবে নাকি?'

'বুঝতে পারছি না।'

'আপনি যান, আমি আসছি। এক্ষুণি আসছি।'

আনিস ঘরে ফিরে গেল। মনের ভুল, নিঃসন্দেহে মনের ভুল। আনিসের মনে হলো সে ঘরের ভেতর গিয়ে দাঁড়ানোমাত্র কেউ-এক জন যেন দরজার আড়ালে সরে পড়ল। রোগা, লম্বা একটি মানুষ। আনিস ডাকল, 'রানু।' রানু তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল, 'কি?'

ইলেকট্রিসিটি চলে এল তখনই। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই রহমান সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'এখন কেমন অবস্থা?' রানু অবাক হয়ে বলল, 'কিসের অবস্থা? কী হয়েছে?'

রহমান সাহেব অবাক হয়ে তাকালেন। আনিস বলল, 'তোমার শরীর খারাপ করেছিল, তাই ওঁকে ডেকেছিলাম। এখন কেমন লাগছে?'

'ভালো।'

রানু উঠে বসল। রহমান সাহেবের দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বলল, 'এখন আমি ভালো।'

রহমান সাহেব তবুও মিনিট দশেক বসলেন। আনিস বলল, 'আপনি কি ছাদে দাপাদাপি শুনেছেন?'

'সে তো রোজই শুনি। বাঁদরের উৎপাত।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম।'

'খুব জ্বালাতন করে। দিনে-দুপুরে ঘর থেকে খাবারদাবার নিয়ে যায়।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি। নতুন এসেছেন তো! কয়েক দিন যাক, টের পাবেন। বাড়িঅলাকে বলেছিলাম গ্রিল দিতে। তা দেবে না। আপনার সঙ্গে দেখা হলে আপনিও বলবেন। সবাই মিলে চেপে ধরতে হবে।'

'জ্বি, আমি বলব। আপনি কি চা খাবেন নাকি এক কাপ?'

'আরে না না! এই রাত আড়াইটার সময় চা খাব নাকি, কী যে বলেন! উঠি ভাই। কোনো অসুবিধা দেখলে ডাকবেন।'

ভদ্রলোক উঠে পড়লেন। রানু চাপা স্বরে বলল, 'এই রাত-দুপুরে ভদ্রলোককে ডেকে আনলে কেন? কী মনে করলেন উনি!'

'তুমি যা শুরু করেছিলে! ভয় পেয়েই ভদ্রলোককে ডাকলাম।'

'কী করেছিলাম আমি?'

'অনেক কাণ্ড করেছ। এখন তুমি কেমন, সেটা বল।'

'ভালো।'

'কী রকম ভালো?'

'বেশ ভালো।'

'ভয় লাগছে না আর?'

'নাহ্।'

রানু বিছানা থেকে নেমে পড়ল। সে বেশ সহজ ও স্বাভাবিক। ভয়ের কোনো চিহ্নও নেই চোখে-মুখে। শাড়ি কোমরে জড়িয়ে ঘরের পানি সরাবার ব্যবস্থা করছে।

'সকালে যা করবার করবে। এখন এসব রাখ তো।'

'ইস্, কী অবস্থা হয়েছে দেখ না!'

'হোক, এস তো এদিকে।'

রানু হাসি-হাসি মুখে এগিয়ে এল।

'এখন আর তোমার ভয় লাগছে না?'

'না।'

'জানালার পাশে কে যেন দাঁড়িয়েছিল বলেছিলে?'

'এখন কেউ নেই। আর থাকলেও কিছু যায় আসে না।'

আনিস দ্বিতীয় সিগারেটটা ধরাল। হালকা গলায় বলল, 'এক কাপ চা করতে পারবে?'

'চা, এত রাতে!'

'এখন আর ঘুম আসবে না, কর দেখি এক কাপ।'

রানু চা বানাতে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পানি ফোটার শব্দ হলো। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে ঝমঝম করে। রানু একা-একা রান্নাঘরে। কে বলবে এই মেয়েটিই অল্প কিছুক্ষণ আগে ভয়ে অস্থির হয়ে গিয়েছিল! ছাদে আবার ঝুপঝুপ শব্দ হচ্ছে। এই বৃষ্টির মধ্যে বানর এসেছে নাকি? আনিস উঠে গিয়ে রান্নাঘরে উঁকি দিল। হালকা গলায় বলল, 'ছাদে বড় ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে?' রানু জবাব দিল না।

আনিস বলল, 'এই বাড়িটা ছেড়ে দেব।'

'সস্তায় এ রকম বাড়ি আর পাবে না।'

'দেখি পাই কি না।'

'চায়ে চিনি হয়েছে তোমার?'

'হয়েছে। তুমি নিলে না?'

'নাহ্, রাত-দুপুরে চা খেলে আমার আর ঘুম হবে না।'

রানু হাই তুলল। আনিস বলল, 'এখন বল তো তোমার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত।'

'কোন স্বপ্নের কথা?'

'ঐ যে স্বপ্ন দেখলে! একটা বেঁটে লোক।'

'কখন আবার এই স্বপ্ন দেখলাম? কী যে তুমি বল!'

আনিস আর কিছু বলল না। চা শেষ করে ঘুমুতে গেল। শীত-শীত করছিল। রানু পা গুটিয়ে বাচ্চা মেয়ের মতো শুয়েছে। একটি হাত দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে আনিসকে। তার ভারি নিঃশ্বাস পড়ছে। ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়। জানালায় নারকেল গাছের ছায়া পড়েছে। মানুষের মতোই লাগছে ছায়াটাকে। বাতাসে গাছের পাতা নড়ছে। মনে হচ্ছে মানুষটি হাত নাড়ছে। ঘরের ভেতর মিষ্টি একটা গন্ধ। মিষ্টি, কিন্তু অচেনা।

আনিস রানুকে কাছে টেনে আনল। রানুর মুখে আলো এসে পড়েছে। কী যে মায়াবতী লাগছে! আনিস ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল। ওদের বিয়ে হয়েছে মাত্র ছ' মাস। আনিস এখনো অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। প্রতি রাতেই রানুর মুখ তার কাছে অচেনা লাগে। অপরূপ রূপবতী একটি বালিকার মুখ, যাকে কখনো পুরোপুরি চেনা যায় না। আনিস ডাকল, 'রানু, রানু।' কোনো জবাব পাওয়া গেল না। গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন রানু। আনিসের ঘুম এল না। শুয়ে-শুয়ে ঠিক করে ফেলল, রানুকে ভালো এক জন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যেতে হবে। অফিসের কমলেন্দুবাবু এক ভদ্রলোকের কথা প্রায়ই বলেন, খুব নাকি গুণী লোক। মিসির সাহেব। দেখালে হয় এক বার মিসির সাহেবকে।

রানু ঘুমের ঘোরে খিলখিল করে হেসে উঠল। অপ্রকৃতিস্থ মানুষের হাসি শুনতে ভালো লাগে না, গা ছমছম করে।

২

ভদ্রলোকের বাড়ি খুঁজে বের করতে অনেক দেরি হলো। কাঁঠালবাগানের এক গলির ভেতর পুরোনো ধাঁচের বাড়ি। অনেকক্ষণ কড়া নাড়বার পর অসম্ভব রোগা এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বিরক্ত মুখে বললেন, 'কাকে চান?'

'মিসির সাহেবকে খুঁজছি।'

'তাকে কী জন্যে দরকার?'

'জ্বি, আছে একটা দরকার। আপনি কি মিসির সাহেব?'

'হ্যাঁ। বলেন, দরকারটা বলেন।'

রাস্তায় দাঁড়িয়ে সমস্যার কথা বলতে হবে নাকি? আনিস অস্বস্তি বোধ করতে

লাগল। কিন্তু ভদ্রলোকের ভাবভঙ্গি এ রকম যে, বাইরেই দাঁড় করিয়ে রাখবেন, ভেতরে ঢুকতে দেবেন না। আনিস বলল, 'ভেতরে এসে বলি?'

'ভেতরে আসবেন? ঠিক আছে, আসুন।'

মিসির সাহেব যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন। ঘন অন্ধকার। তিন-চারটা বেতের চেয়ার ছাড়া আসবাবপত্র কিছু নেই।

'বসুন আপনি।'

আনিস বসল। ভদ্রলোক বললেন, 'আজ আমার শরীর ভালো না। আলসার আছে। ব্যথা হচ্ছে এখন। তাড়াতাড়ি বলেন কি বলবেন।'

'আমার স্ত্রীর একটা ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছি। আপনার নাম শুনেই এসেছি।'

'আমার নাম শুনে এসেছেন?'

'জ্বি।'

'আমার এত নামডাক আছে, তা তো জানতাম না! স্পেসিফিক্যালি বলুন তো কার কাছে শুনেছেন?

আনিস আমতা-আমতা করতে লাগল। ভদ্রলোক অসহিষ্ণু স্বরে বললেন, 'বলুন, কে বলল?'

'আমাদের অফিসের এক ভদ্রলোক। কমলেন্দুবাবু। আপনি নাকি তাঁর বোনের চিকিৎসা করেছিলেন।'

'ও আচ্ছা, চিনেছি, কমলেন্দু। শোনেন, আমি কিন্তু ডাক্তার না, জানেন তো?'

'জ্বি স্যার, জানি।'

'আচ্ছা, আগে এক কাপ চা খান, তারপর কথা বলব। রুগীটি কে বললেন? আপনার স্ত্রী?'

'জ্বি।'

'বয়স কত?'

'ষোল-সতের।'

'বলেন কী! আপনার বয়স তো মনে হয় চল্লিশের মতো, ঠিক না?'

আনিস শুকনো গলায় বলল, 'আমার সাঁইত্রিশ।'

'এ রকম অল্পবয়সী মেয়ে বিয়ে করেছেন কেন?'

এটা আবার কেমন প্রশ্ন। আনিসের মনে হলো, কমলেন্দুবাবুর কথা শুনে এখানে আসাটা ঠিক হয় নি। ভদ্রলোকের নিজেরই মনে হয় মাথার ঠিক নেই। এক জন অপরিচিত মানুষকে কেউ এ রকম কথা জিজ্ঞেস করে?

'বলুন বলুন, এ রকম অল্পবয়েসী মেয়ে বিয়ে করলেন কেন?'

'হয়ে গেছে আর কি।'

'বলতে চান না বোঝা যাচ্ছে। ঠিক আছে, বলতে হবে না। চা'র কথা বলে আসি। চা খেয়ে তারপর শুরু করব।'

ভদ্রলোক আনিসকে বাইরে বসিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। তারপর আর আসার নামগন্ধ নেই। আট-ন' বছরের একটি বাচ্চা মেয়ে এক কাপ দারুণ মিষ্টি সর-ভাষা চা দিয়ে চলে গেল। তারপর আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। দেখতে-দেখতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। আনিস বেশ কয়েক বার কাশল। দুই বার গলা উঁচিয়ে ডাকল, 'বাসায় কেউ আছেন?' কোনো সাড়া নেই। কী ঝামেলা!

কমলেন্দুবাবু অবশ্য বারবার বলে দিয়েছেন—এই লোকের কথাবার্তার ঠিকঠিকানা নেই। তবে লোকটা অসাধারণ। আনিসের কাছে অসাধারণ কিছু মনে হয় নি। তবে চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ। এইটি অবশ্য প্রথমেই চোখে পড়ে। আর দ্বিতীয় যে জিনিসটি চোখে পড়ে, সেটি হচ্ছে তার আঙুল। অস্বাভাবিক লম্বা-লম্বা সব ক'টা আঙুল।

'এই যে, অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম।'

'না, ঠিক আছে।'

'ঠিক থাকবে কেন? ঠিক না।'

লোকটি এই প্রথম বার হাসল। থেমে-থেমে বলল, 'আলসার আছে তো, ব্যথায় কাহিল হয়ে শুয়েছিলাম। অমনি ঘুম এসে গেল।'

'আমি তাহলে অন্য এক দিন আসি?'

'না, এসেছেন যখন বসুন। চা দিয়েছিল?'

'জ্বি।'

'বেশ, এখন বলুন কী বলবেন?'

আনিস চুপ করে রইল। এটা এমন একটা ব্যাপার, যা চট করে অপরিচিত কাউকে বলা যায় না। ভদ্রলোক শান্ত স্বরে বললেন, 'আপনার স্ত্রীর মাথার ঠিক নেই, তাই তো?'

'জ্বি-না স্যার, মাথা ঠিক আছে।'

'পাগল নন?'

'জ্বি-না।'

'তাহলে আমার কাছে এসেছেন কেন?'

'মাঝে-মাঝে সে অস্বাভাবিক আচরণ করে।'

'কী রকম অস্বাভাবিক?'

'ভয় পায়। মাঝে-মাঝেই এ রকম হয়।'

'ভয় পায়? তার মানে কী? কিসের ভয়?'

'ভূতের ভয়।'

'ঠিক জানেন, ভয়টা ভূতের?'

'জ্বি-না, ঠিক জানি না। মনে হয় এ রকম।'

ভদ্রলোক একটি চুরুট ধরিয়ে খকখক করে কাশতে-কাশতে বললেন, 'বর্মা থেকে আমার এক বন্ধু এনেছে, অতি বাজে জিনিস।' আনিস কিছু বলল না। তবে এই ভদ্রলোকের স্টাইলটি তার পছন্দ হলো। ভদ্রলোক অবলীলায় অন্য একটি প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। এবং এমনভাবে কথা বলছেন, যেন আগের কথাবার্তা তাঁর কিছুই মনে নেই।

'এ রকম চুরুট চার-পাঁচটা খেলে যক্ষ্মা হয়ে যাবে। আপনাকে দেব একটা?'

'জ্বি-না।'

'ফেলে দিলে মায়া লাগে বলে খাই। খাওয়ার জিনিস না। অখাদ্য। তবে হাভানা চুরুটগুলি ভালো। হাভানা চুরুট খেয়েছেন কখনো?'

'জ্বি-না।'

'খুব ভালো। মাঝে-মাঝে আমার এক বন্ধু আমাকে দিয়ে যায়।'

ভদ্রলোক চুরুটে টান দিয়ে আবার ঘর কাঁপিয়ে কাশতে লাগলেন। কাশি থামতেই বললেন, 'এখন আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। যথাযথ জবাব দেবেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'প্রথম প্রশ্ন, আপনার স্ত্রী কি সুন্দরী?'

'জ্বি।'

'বেশ সুন্দরী?'

'জ্বি।'

'আপনার স্ত্রী কখন ভয় পান—রাতে না দিনে?'

'সাধারণত রাতে। তবে এক বার দুপুরে ভয় পেয়েছিল।'

'ভয়টা কী রকম সেটা বলেন।'

'মনে হয় কিছু-একটা দেখে।'

'সব বার একই জিনিস দেখেন, না একেক বার একেক রকম?'

'এটা আমি ঠিক বলতে পারছি না।'

'এই সময় কি তিনি কোনো রকম গন্ধ পান?'

'আমি ঠিক বলতে পারছি না।'

'যখন সুস্থ হয়ে ওঠেন, তখন কি তাঁর ভয়ের কথা মনে থাকে?'

'বেশির ভাগ সময়ই থাকে না, তবে মাঝে-মাঝে থাকে।'

'আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই খারাপ।'

'জ্বি।'

'উনি প্রথম কখন ভয় পেয়েছিলেন, বলতে পারেন?'

'জ্বি-না। তবে খুব ছোটবেলায়।'

'প্রথম ভয়ের ঘটনাটা আমাকে বলুন।'

'আমি সেটা ঠিক জানি না।'

'আপনি অনেক কিছুই জানেন না মনে হচ্ছে। আপনার স্ত্রীকে একদিন নিয়ে আসুন।'

আনিস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমি তাকে আনতে চাই না।'

'কেন চান না?'

'সে খুব সেনসিটিভ। সে যদি টের পায় যে, তার এই অস্বাভাবিকতা নিয়ে আমি লোকজনের সাথে আলাপ করছি, তাহলে খুব মন-খারাপ করবে।'

'দেখুন ভাই, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা না-বলে কিছুই করা যাবে না। আপনার স্ত্রী অসুস্থ এবং আমার মনে হচ্ছে এই অসুখ দ্রুত বেড়ে যাবে। আপনি তাঁকে নিয়ে আসবেন।'

আনিস উঠে দাঁড়াল। ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আপনাকে কত দেব?'

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কমলেন্দুবাবু কি আপনাকে বলেন নি আমি ফিস নিই না? এই কাজটি আমি শখের খাতিরে করি, বুঝতে পারছেন?'

'জ্বি পারছি।'

'তবে আপনি যদি ভালো গোলাপের চারা পান, তাহলে আমাকে দিতে পারেন। আমার গোলাপের খুব শখ। সব মিলিয়ে ত্রিশটি ডিফারেন্ট ভেরাইটির চারা আমার কাছে আছে। একটা আছে দারুণ ইন্টারেস্টিং, ঘাসফুলের মতো ছোট সাইজের গোলাপ।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি। ওরা বলে মাইক্রো রোজ। হল্যাণ্ডের গোলাপ। কড়া গন্ধ। দেখবেন?'

'আরেক দিন দেখব। আজ দেরি হয়ে গেছে, আমার স্ত্রী একা থাকে।'

'ও, তাই নাকি? শোনেন, একা তাকে রাখবেন না। কখনো যেন মেয়েটি একা না থাকে। এটা খুবই জরুরি।'

রাস্তায় নেমে আনিসের মন খারাপ হয়ে গেল। খামোকা সময় নষ্ট। লোকটি তেমন কিছু জানে না। কমলেন্দুবাবু যে সব আধ্যাত্মিক শক্তিটক্তির কথা বলেছেন, সে সব মনে হয় নেহায়েতই গালগল্প। তবে লোকটির কথাবার্তা বেশ ফোর্সফুল।

রানুকে বুঝিয়েসুঝিয়ে এক বার এনে দেখালে হয়। ক্ষতি তো কিছু নেই।

তা ছাড়া ভদ্রলোক খুব সম্ভব ফ্যালনাও নন। ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াট্রির টীচার। একেবারে কিছু না-জেনে তো কেউ মাষ্টারি করে না। কিছু নিশ্চয়ই জানেন। মানুষের চেহারা দেখে কিছু অনুমান করাটাও ঠিক না।

৩

আনিস অফিসে চলে গেলে রানুর খুব একলা লাগে। কিছুই করার থাকে না। গোছানো আলনা আবার নতুন করে গোছায়। বসার ঘরের বেতের সোফা ঝাড়ন দিয়ে ঝাড়ে। শোবার মেঝে ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে মুছতে-মুছতে চকচকে করে ফেলে, তবু সময় কাটে না। এক সময় তেতলার বারান্দায় গিয়ে বসে। এ-বাড়ির ছোট বারান্দাটি তার খুব পছন্দ। গ্রিল দেওয়া বারান্দাটি গোলাকার। এখানে বসে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। সামনেই একটা মেয়েদের স্কুল। টিফিন টাইমে মেয়েগুলোর কাণ্ডকারখানা দেখতে এমন মজা লাগে! রানু প্রায় সারা দুপুর বারান্দাতেই বসে থাকে। একা-একা ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগে না। কেমন যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। একটু যেন ভয়ভয়ও লাগে।

অবশ্য যখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামতে থাকে, তখন ভয়ভয় ভাবটা কমে যায়। বিকেলবেলা বাড়িঅলার মেয়ে দুটি তাদের ভেতরের দিকের বাগানে বসে মজা করে চা খায়। চা খেতে-খেতে দুইজনেই খুব হাসাহাসি করে। একেক দিন ওদের বাবাও সঙ্গে বসেন, রানুর দেখতে বেশ লাগে।

ছোট মেয়েটির সঙ্গে রানুর কিছু দিন আগে আলাপ হয়েছিল। বেশ মেয়েটি! খুব স্মার্ট। দেখতেও সুন্দর। এক দিন দুপুরে রানু বারান্দায় এসে বসেছে, মেয়েটি এসে উপস্থিত। মুখে চাপা হাসি। হাতে কী-একটা বই। এসেই বলল, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।'

'কি কথা?'

'আপনি সারা দিন বারান্দায় বসে থাকেন কেন?'

'সারা দিন কোথায়? দুপুরবেলায় বসি। কিছু করার নেই তো, একা-একা লাগে।'

'তা ঠিক। বসব আপনার এখানে? আজ আমি কলেজে যাই নি। বোটানি প্র্যাকটিক্যাল ছিল আজকে।'

মেয়েটি খুব সহজভাবে বসল। ঘন্টাখানেকের মধ্যে একগাদা কথা বলল। তারপর যাবার সময় হঠাৎ বলল, 'আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কর।'

'আপনি এত সুন্দর কেন? যে আমার চেয়েও সুন্দরী, তাকে আমার ভালো লাগে না।'

রানু কী বলবে ভেবে পেল না। মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল, 'আমাদের ক্লাসের মেয়েদের কি ধারণা, জানেন? তাদের ধারণা, আমি হচ্ছি বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা। ওদের এক দিন এনে আপনাকে দেখিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে, দিও। আরেকটু বস। চা খাবে?'

'না, চা আমি বেশি খাই না। বেশি চা খেলে গায়ের রঙ ময়লা হয়ে যায়।'

মেয়েটি যেমন হুট করে এসেছিল, তেমনি হুট করে নিচে নেমে গেল। বেশ লাগল রানুর। নতুন বাসাটা তার ভালোই লাগছে। পুরোনো ঢাকায় হলেও বেশ নিরিবিলি। মালিবাগের বাসাটার মতো নয়। নিঃশ্বাস নেবার জায়গা ছিল না সেখানে। পাশ দিয়ে রাত-দিন রিকশা যাচ্ছে, গাড়ি যাচ্ছে। জঘন্য! এই বাসাটা ভেতরের দিকে। বাড়িঅলা ভদ্রলোকও বেশ ভালোমানুষ। প্রথম দিনেই আনিসকে বলেছেন, 'আমার বাড়ি ভাড়া দেবার দরকার নেই। টাকার জন্যেই তো বাড়ি ভাড়া। টাকা যথেষ্ট আছে। তবু দুই ঘর ভাড়াটে রাখি। কারণ এত বড় বাড়িতে মানুষ না-থাকলে ভালো লাগে না। কবরখানা-কবরখানা ভাব চলে আসে। তবে সবাইকে আমি বাড়ি ভাড়া দিই না। আপনাকে দিচ্ছি, কারণ আপনাকে পছন্দ হয়েছে।'

ভাড়াও খুব কম। মাত্র ছয় শ' টাকা। তিন-রুমের এত বড় একটা বাড়ি ছয় শ' টাকায় পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। রানু এখানে এসে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। তার সবচেয়ে পছন্দ হয়েছে বাথরুম। বড় ঝকঝকে একটা বাথরুম। বাসাটা রানুর খুব পছন্দ হয়েছিল। আনিস যখন বলল, 'কি, নেব? পছন্দ হয়?'

'হয়।'

'ভালো করে ভেবে বল নেব কি না। দুই দিন পর যদি বল পছন্দ না, তাহলে মুশকিলে পড়ব। মালিবাগের বাসাটা ভালো ছিল। শুধু-শুধু বদলালাম।'

'এই বাসাটাও ভালো।'

রানু খুব খুশি মনে নতুন বাসা সাজাল। নিজেই পরদা কিনে আনল, সারা রাত জেগে সেলাই করল। তার উৎসাহের সীমা নেই।

'বুঝলে রানু, সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকবে। অন্যদের বাসায় যাবে-টাবে। একা-একা থাকার অভ্যেসটা ভালো না। যাবে তো?'

'যাব।'

'একা থাকলেই মানুষের মধ্যে নানান রকম প্রবলেম দেখা যায়, বুঝলে? সব ভাড়াটেদের সঙ্গে খাতির রাখবে।'

'ভাড়াটে তো মাত্র এক জন।'

'ঐ ওনার বাসাতেই যাবে। বাড়িঅলার বাসায়ও যাবে।'

'আচ্ছা, যাব।'

রানু অবশ্যি যায় নি কোথাও। তার ভালো লাগে না। অন্যদের মতো সে কারো সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারে না। অন্যদের সামনে কেমন যেন আড়ষ্ট লাগে। বারান্দার বেতের চেয়ারটাতে বসে থাকতেই বেশি ভালো লাগে। দুপুরটাই যা কষ্টের। দুপুরটা কেটে গেলেই অন্যরকম একটা শান্তি লাগে।

কিন্তু আজকের দুপুরটা দীর্ঘ। কিছুতেই আর কাটছে না। বারান্দায় বসে থাকতেও ভালো লাগছে না। মেয়েদের স্কুলটাও কী কারণে যেন বন্ধ। চারদিকে চুপচাপ। বড্ড ফাঁকা। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলে কেমন হয়?

ঘরের ভেতরটা কেমন যেন অন্যরকম। রানু ভেতরে ঢুকে জানালার পর্দা ফেলে দিল। অনেকখানি অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকার ও চুপচাপ। আর তখন স্পষ্ট গলায় কেউ ডাকল, 'রানু, রানু।' কয়েক মুহূর্ত রানু নড়ল না। অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু যে ডেকে উঠেছে, সে দ্বিতীয় বার আর ডাকল না।

রাণুর এ রকম চারদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে এক জন অশরীরী কেউ ডেকে ওঠে। অসংখ্যবার শুনেছে এই ডাক। কে সে! কোথেকে আসে সে! রানু ফিসফিস করে বলল, 'কে?' কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

'কে তুমি?'

জানালার পরদাটা শুধু কাঁপছে। বিকেল হয়ে আসছে। রানু ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নিচের বাগানে বাড়িঅলার বড় মেয়েটি হাঁটছে। নীলু বোধহয় ওর নাম। এই মেয়েটি তার বোনের মতো নয়। গম্ভীর। কথাবার্তা প্রায় বলেই না। তবুও ওকে দেখলেই রানুর মনে হয়—মেয়েটি বড় ভালো। মায়াবতী মেয়ে।

রানু দেখল—বিষণ্ন ভঙ্গিতে মেয়েটি একা-একা বসে আছে। তার ইচ্ছা হল নিচে নেমে ওর সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু সে গেল না।

৪

নীলু দুই বার বিজ্ঞাপনটা পড়ল। বেশ একটা মজার বিজ্ঞাপন।

কেউ কি আসবেন?

আমি একজন নিঃসঙ্গ মানুষ। স্ত্রীর মৃত্যুর পর একা জীবন-যাপন করছি। সময় আর কাটে না। আমার দীর্ঘ দিবস ও দীর্ঘ

রজনীর নিঃসঙ্গতা কাটাতে কেউ আমাকে দুই লাইন লিখবেন?

জিপিও বক্স নাম্বার ৭৩

দৈনিক পত্রিকায় এ রকম বিজ্ঞাপন দেবার মানে কী? সাপ্তাহিক কাগজগুলিতে এই সব থাকে; ছেলেছোকরাদের কাণ্ড। এই লোকটি নিশ্চয় ছেলেছোকরা নয়। বুড়ো-হাবড়াদের একজন।

'বাবা, এটা পড়েছ?'

নীলু জাহিদ সাহেবের হাতে কাগজটা গুঁজে দিল।

'বাবা, এই বিজ্ঞাপনটি পড় তো!'

জাহিদ সাহেব নিজেও ভ্রূ কুঞ্চিত করে দুই বার পড়লেন। তাঁর মুখের ভঙ্গি দেখে মনে হল বেশ বিরক্ত হয়েছেন।

'পড়েছ?'

'হুঁ, পড়লাম।'

'কী মনে হয় বাবা?'

'কী আবার মনে হবে? কিছুই মনে হয় না। দেশটা রসাতলে যাচ্ছে। খবরের কাগজঅলারা এইসব ছাপে কীভাবে!'

নীলু হাসিমুখে বলল, 'ছাপাবে না কেন?'

'দেশটা বিলাত-আমেরিকা নয়, বুঝলি? আর ভালো করে পড়লেই বোঝা যায়, লোকটার একটা বদ মতলব আছে।'

'কই, আমি তো বদ মতলব কিছু বুঝছি না।'

জাহিদ সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'দেখিস, তুই আবার চিঠি লিখে বসবি না।'

নীলু মুখ নিচু করে হাসল।

'হাসছিস কেন?'

'এমনি হাসছি।'

'চিঠি লিখবার কথা ভাবছিস না তো মনে-মনে?'

'উঁহু।'

নীলু মুখে উঁহু বললেও মনে-মনে ঠিক করে ফেলল, গুছিয়ে একটা চিঠি লিখবে। দেখা যাক না কী হয়। কী লেখে লোকটি।

রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে সে সত্যি একটা চিঠি লিখে ফেলল। মোটামুটি বেশ দীর্ঘ চিঠি।

জনাব,

আপনার বিজ্ঞাপনটি পড়লাম। লিখলাম কয়েক লাইন। এতে

কি আপনার নিঃসঙ্গতা কাটবে? আমার বয়স আঠার। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। আমরা দু'বোন। আমার ছোট বোনটির নাম বিলু। সে হলিক্রস কলেজে পড়ে। আমরা দু'বোনই খুব সুন্দরী। এই যা, এটা আপনাকে লেখা ঠিক হল না। তাই না? নাকি সুন্দরী মেয়েদের চিঠি পেলে আপনার নিঃসঙ্গতা আরো দ্রুত কাটবে?

নীলু

চিঠিটি লিখেই তার মনে হলো যে, এ রকম লেখাটা ঠিক হচ্ছে না। চিঠির মধ্যে একটা বড় মিথ্যা আছে। সে সুন্দরী নয়। বিলুর জন্যে কথাটা ঠিক, তার জন্যে নয়। নীলু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে দ্বিতীয় চিঠিটি লিখল।

জনাব,

আমার নাম নীলু। আমার বয়স কুড়ি। আপনার নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যে আপনাকে লিখছি। কিন্তু চিঠিতে কি কারো নিঃসঙ্গতা কাটে? আপনার বয়স কত, এটা দয়া করে জানাবেন।

নীলু

দ্বিতীয় চিঠিটিও তার পছন্দ হলো না। তার মনে হলো, সে যেন কিছুতেই গুছিয়ে আসল জিনিসটি লিখতে পারছে না। রাতে শুয়ে-শুয়ে তার মনে হলো, হঠাৎ করে সে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে কেন? চিঠি লেখারই-বা কী দরকার? সে নিজেও কি খুব নিঃসঙ্গ? হয়তো-বা। এ বাড়িতে আর দুটি মাত্র প্রাণী। বিলু আর বাবা। বাবা দিন-রাত নিজের ঘরেই থাকেন। মাসের প্রথম দিকের কয়েকটা দিন বাড়িভাড়ার টাকা আদায়ের জন্যে অল্প যা নড়াচড়া করেন। তারপর আবার নিজের ঘরেই বন্দি। আর বিলু তো আছে তার অসংখ্য বন্ধুবান্ধব নিয়ে। শুধু মেয়েবন্ধু নয়, তার আবার অনেক ছেলেবন্ধুও আছে।

মহানন্দে আছে বিলু। তবে সে একটু বাড়াবাড়ি করছে। কাল তার কাছে একটি ছেলে এসেছিল, সে রাত আটটা পর্যন্ত ছিল। এ সব ভালো নয়। নীলু উঁকি দিয়ে দেখেছে, ছেলেটি ফরফর করে সিগারেট টানছে। হাত নেড়ে-নেড়ে কথা বলছে। আর বীলু হাসতে-হাসতে ভেঙে পড়ছে। ভাত খাওয়ার সময় নীলু কিছু বলবে না বলবে না করেও বলল, 'ছেলেটা কে রে?'

'কোন ছেলে?'

'ঐ যে রাত আটটা পর্যন্ত গল্প করলি?'

'ও, সে তো রুবির ভাই! মহা চালবাজ। নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবে, আসলে মহা গাধা।'

বলতে-বলতে খিলখিল করে হাসে বিলু।

'মহা গাধা হলে এতক্ষণ বসিয়ে রাখলি কেন?'

'যেতে চাচ্ছিল না তো কী করব?'

বলতে বলতে বিলু আবার হাসল। বিলু এমন মেয়ে, যার ওপর কখনো রাগ করা যায় না। নীলু কখনো রাগ করতে পারে না। মাঝে-মাঝে বাবা দুই-একটা কড়া কথা বলেন। তখন বিলু রাগ করে খাওয়া বন্ধ করে দেয়। সে এক মহা যন্ত্রণা! একবার রাগ করে সে পুরো দুদিন দরজা বন্ধ করে বসেছিল। কত সাধাসাধি, কত অনুরোধ! শেষ পর্যন্ত মগবাজারের ছোটমামাকে আনতে হলো। ছোটমামা বিলুর খুব খাতিরের মানুষ। তাঁর সব কথা সে শোনে। তিনি এসে যখন বললেন, 'দরজা না খুললে মা আমি কিন্তু আর আসব না। এই আমার শেষ আসা–' তখন দরজা খুলল। এ রকম জেদী মেয়ে।

নীলুর কোনো জেদ-টেদ নেই। কালো এবং অসুন্দরী মেয়েদের জেদ কখনো থাকে না। এদের জীবন কাটাতে হয় একাকী। নীলু বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করল। ছোটবেলার বাতি নেভানোর সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম আসত, এখন আর আসে না। অনেক রাত পর্যন্ত এপাশ-ওপাশ করতে হয়।

পাশের খাটে টেবিল-ল্যাম্প জ্বালিয়ে চোখের ওপর একটা গল্পের বই ধরে আছে বিলু। অনেক রাত পর্যন্ত সে পড়বে। পড়তে-পড়তে হঠাৎ এক সময় ঘুমিয়ে পড়বে, বাতি নেভাবে না। মশারি ফেলবে না। নীলুকেই উঠে এসে বাতি নেভাতে হবে, মশারি ফেলতে হবে।

'বিলু ঘুমো, বাতি নেভা।'

'একটু পরে ঘুমাব।'

'কী পড়ছিস?'

'শীর্ষেন্দুর একটা বই। দারুণ!'

'দিনে পড়িস। আলো চোখে লাগছে।'

'দিনে আমার সময় কোথায়? তুমি ঘুমাও-না!'

নীলু ঘুমাতে পারল না। শুয়ে-শুয়ে তাকিয়ে রইল বিলুর দিকে। দিনে-দিনে কী যে সুন্দর হচ্ছে মেয়েটা! একই বাবা-মার দুই মেয়ে– একজন এত সুন্দর আর অন্য জন এত অসুন্দর কেন? নীলু ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

'আপা?'

'কী?'

'দারুণ বই, তুমি পড়ে দেখ।'

'প্রেমের?'

'হ্যাঁ। প্রেমের হলেও খুব সিরিয়াস জিনিস। দারুণ!'

'তাই নাকি?'

'হুঁ, একজন খুব রূপবতী মেয়ের গল্প।'

তোর মতো একজন?'

'দূর, আমি আবার সুন্দর নাকি? আমাদের তিনতলার ভাড়াটের বৌটির মতো বলতে পার। রানু নাম, দেখেছ?'

'না তো, খুব সুন্দরী?'

'ওরে ব্বাপ, দারুণ! হেমা মালিনীর চেয়েও সুন্দরী।'

'তুই মেয়েটিকে এক বার আসতে বলিস তো আমাদের বাড়িতে! দেখব।'

'বলব। তুমি নিজে এক বার গেলেই পার। মেয়েটা ভালো। কথাবার্তায় খুব ভদ্র। ওর বরকে দেখেছ, আনিস সাহেব?'

'হুঁ।'

'ঐ লোকটা বোকা ধরনের। বোকার মতো কথাবার্তা। আমাকে আপনি-আপনি করে বলে।'

'কলেজে পড়িস, তোকে আপনি বলবে না?'

'ফ্রক-পরা কাউকে এ রকম এক জন বুড়ো মানুষ আপনি বলবে নাকি?'

'বুড়ো নাকি?'

'চল্লিশের ওপর বয়স হবে।'

'মেয়েটার বয়স কত?'

'খুব কম। চোদ্দ-পনের হবে।'

বিলু বাতি নিভিয়ে দিল এবং নিমিষেই ঘুমিয়ে পড়ল। নীলু জেগে রইল অনেক রাত পর্যন্ত। কিছুতেই তার ঘুম এল না। ইদানীং তার ঘুম খুব কমে গেছে। রোজই মাঝরাত না হওয়া অবধি ঘুম আসে না।

রানু চুলায় ভাত চড়িয়ে বসার ঘরে এসে দেখে বাড়িঅলার বড় মেয়েটি ঘরের ভেতর।

'না জিজ্ঞেস করেই ঢুকে পড়লাম ভাই। আমার নাম নীলু।'

'আসুন, আসুন। আপনাকে আমি চিনি। আপনি বাড়িঅলার বড় মেয়ে। আজ ইউনিভার্সিটি যান নি?'

'উঁহু। আজ ক্লাস নেই। আপনার সঙ্গে গল্প করতে এলাম। কী করছিলেন?'

'ভাত রান্না করছি।'

'চলুন, রান্নাঘরে গিয়ে বসি। বিলুর কাছ থেকে আপনার খুব প্রশংসা শুনি।

বিলুর ধারণা, আপনি হচ্ছেন হেমা মালিনী।'

রানু অবাক হয়ে বলল, 'হেমা মালিনীটি কে?'

'আছে একজন। সিনেমা করে। সবাই বলে খুব সুন্দর। আমার কাছে সুন্দর লাগে না। চেহারাটা অহঙ্কারী।'

রানু মুখ টিপে হাসতে-হাসতে বলল, 'সুন্দরী মেয়েরা তো অহঙ্কারীই হয়।'

'আপনিও অহঙ্কারী?'

রানু হাসতে হাসতে বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে আপনি আপনি বলতে পারবেন না। তুমি করে বলতে হবে।'

নীলু লক্ষ্য করল মেয়েটি বেশ রোগা কিন্তু সত্যিই রূপসী। সচরাচর দেখা যায় না। চোখ দুটি কপালের দিকে ওঠান বলে—দেবী-প্রতিমার চোখের মতো লাগে। সমগ্র চেহারায় খুব সূক্ষ্ম হলেও কোথাও যেন একটি মূর্তি-মূর্তি ভাব আছে।

'কী দেখছেন?'

'তোমাকে দেখছি ভাই। তোমার চেহারায় একটা মূর্তি-মূর্তি ভাব আছে।'

রানু মুখ কালো করে ফেলল। নীলু অবাক হয়ে বলল, 'ও কী! তুমি মনে হয় মন-খারাপ করলে?'

'না, মন-খারাপ করব কেন?'

'কিন্তু এমন মুখ কালো করলে কেন? আমি কিন্তু কমপ্লিমেন্ট হিসেবে তোমাকে বলেছি। তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে আমি খুব বেশি দেখি নি। তবে এক বার একটি বিহারি মেয়েকে দেখেছিলাম। আমার ছোটমামার বিয়েতে। অবশ্যি সে মেয়েটি তোমার মতো রোগা ছিল না। ওর স্বাস্থ্য বেশ ভালো ছিল।'

'আপনি কি একটু চা খাবেন?'

'তুমি আমাকে আপনি করে বলছ কেন? তোমার কি মনে হয় আমার বয়স অনেক বেশি?'

'না, তা মনে হয় না।'

'তুমিও আমাকে তুমি বলবে। আর তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে আমি মাঝে-মাঝে তোমার কাছে আসব।'

রানু চায়ের কাপ সাজাতে-সাজাতে মৃদু স্বরে বলল, 'আমাকে মূর্তি-মূর্তি লাগে, এটা বললে কেন?'

নীলু অবাক হয়ে বলল, 'এমনি বলেছি! টানাটানা চোখ তো, সে জন্যে। তুমি দেখি ভাই রাগ করেছ।'

'একটা কারণ আছে নীলু। তোমাকে আমি এক দিন সব বলব, তাহলেই বুঝবে। চায়ে কতটুকু চিনি খাও?'

'তিন চামচ।'

নীলু অনেকক্ষণ বসল, কিন্তু কথাবার্তা আর তেমন জমল না। রানু কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। কিছুতেই মন লাগাতে পারছে না। সহজ হতে পারছে না। নীলু বেশ কয়েক বার অন্য প্রসঙ্গ আনতে চেষ্টা করল। ভাসা-ভাসা জবাব দিল রানু। এবং একসময় হালকা স্বরে বলল, 'আমার একটা অসুখ আছে নীলু।'

'কি অসুখ?'

'মাঝে-মাঝে আমি ভয় পাই।'

'ভয় পাই মানে?'

রানু মাথা নিচু করে বলল, 'ছোটবেলায় এক বার নদীতে গোসল করতে গিয়েছিলাম, তার পর থেকে এ রকম হয়েছে।'

'কী হয়েছে?'

রানু জবাব দিল না।

'বল, কী হয়েছে?'

'অন্য এক দিন বলব। আজ তুমি তোমার কথা বল।'

'আমার তো বলার মতো কোনো কথা নেই।'

'তোমার বন্ধুদের কথা বল।'

'আমার তেমন কোনো বন্ধুও নেই। আমি বলতে গেলে একা-একা থাকি। অসুন্দরী মেয়েদের বন্ধুটন্ধু থাকে না।'

'রঙ খারাপ হলে মানুষ অসুন্দর হয় না নীলু।'

'আমি নিজে কী, সেটা আমি ভালোই জানি।'

নীলু উঠে পড়ল। রানু বলল, 'আবার আসবে তো?'

'আসব। তুমি তোমার ভয়ের কথাটথা কি বলছিলে, সেই সব বলবে।'

'বলব।'

নীলু পাঠাবে না পাঠাবে না করেও চিঠিটি পাঠিয়ে দিল, কিন্তু তার পরপরই দুশ্চিন্তার সীমা রইল না। কে জানে, বুড়ো-হাবড়া লোকটি এক দিন হয়তো বাসায় এসে হাজির হবে। দারুণ লজ্জার ব্যাপার হবে সেটা। নিতান্তই ছেলেমানুষি কাজ করা হয়েছে। চার-পাঁচ দিন নীলুর খুব খারাপ কাটল। দারুণ অস্বস্তি। বুড়োমতো কোনো মানুষকে আসতে দেখলেই চমকে উঠত, এটিই সেই লোক নাকি? যদি সত্যি-সত্যি কেউ এসে পড়ে, তাহলে সে ভেবে রেখেছে বলবে—এই চিঠি তো আমার নয়। অন্য কেউ তামাশা করে এই ঠিকানা দিয়েছে। আমি এ রকম অজানা-অচেনা কাউকে চিঠি লিখি না।

কেউ অবশ্যি এল না। দেখতে-দেখতে এক সপ্তাহ কেটে গেল। চিঠিরও কোনো উত্তর নেই। লোকটি হয়তো চিঠি পায় নি। ডাকবিভাগের কল্যাণে আজকাল তো বেশির ভাগ চিঠিই প্রাপকের হাতে পৌঁছায় না। এতে ক্ষতি যেমন হয়, লাভও তেমনি হয়। কিংবা হয়তো এমন হয়েছে, ঐ লোক অসংখ্য চিঠি পেয়ে পছন্দমতো চিঠিগুলোর উত্তর দিয়েছে। নীলুর তিন লাইনের চিঠি তার পছন্দ হয় নি। সে হয়তো লম্বা-লম্বা চমৎকার সব চিঠি পেয়েছে। ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কিছু লেখা সব চিঠিতে।

দশ দিনের মাথায় নীলুর কাছে চিঠি এসে পড়ল। খুবই দামী একটা খামে চমৎকার প্যাডের কাগজে চিঠি। গোটা-গোটা হাতের লেখা। কালির রঙ ঘন কালো। মাখন-রাঙা সে কাগজে লেখাগুলো মুক্তার মতো ফুটে আছে। এত সুন্দর হাতের লেখাও মানুষের হয়! চিঠিটি খুবই সংক্ষিপ্ত।

কল্যাণীয়াসু

তোমার চমৎকার চিঠি গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। একজন ব্যথিত মানুষের আবেদনে তুমি সাড়া দিয়েছ—তোমাকে ধন্যবাদ। খুব সামান্য একটি উপহার পাঠালাম। প্লীজ, নাও।

আহমেদ সাবেত

উপহারটি সামান্য নয়। অত্যন্ত দামী একটি পিওর পারফিউমের শিশি।

নীলু ভেবে পেল না, এই লোকটি কি সবাইকে এ রকম একটি উপহার পাঠিয়েছে? যারাই চিঠির জবাব দিয়েছে তারাই পেয়েছে? কিন্তু তাও কি সম্ভব? নাকি নীলু একাই চিঠির জবাব দিয়েছে? নীলুর বড় লজ্জা করতে লাগল। সে পারফিউমের শিশিটি লুকিয়ে রাখল এবং খুব চেষ্টা করতে লাগল সমস্ত ব্যাপার ভুলে যেতে। সে চিঠিটি কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিল জানালা দিয়ে। কেন এমন একটা বাজে ঝামেলায় জড়াল?

কিন্তু দিন সাতেক পর নীলু আবার একটি চিঠি লিখল। একটি বেশ দীর্ঘ চিঠি। সেখানে শেষের দিকে লেখা—আপনি কে, কী করেন—কিছুই তো জানান নি। আপনার বিজ্ঞাপনটিও দেখছি না। তার মানে কি এই যে আপনার নিঃসঙ্গতা এখন দূর হয়েছে?

নীলু বেশ কিছু দিন অপেক্ষা করল চিঠির জবাবের জন্যে, কিন্তু কোনো জবাব এল না। কেন জানি নীলুর বেশ মন-খারাপ হল। আরেকটি চিঠি লেখার ইচ্ছা হতে লাগল, কিন্তু তাও কি হয়? একা-একা সে শুধু চিঠি লিখবে? তার এত কী গরজ পড়েছে?

৫

দুপুর-রাতে আনিসের ঘুম ভেঙে গেল। হাত বাড়াল অভ্যেসমতো। পাশে কেউ নেই। আনিস ডাকল, 'রানু, রানু।' কোনো সাড়া নেই। বাথরুম থেকে একটানা পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে। বাথরুমে নাকি? আনিস উঁকি দিল বাথরুমে—কেউ নেই। কোথায় গেল! আনিস গলা উঁচিয়ে ডাকল, 'রানু।' বসার ঘর থেকে ক্ষীণ হাসির শব্দ এল। বসার ঘর অন্ধকার। রানু কি সেখানে একা-একা বসে আছে নাকি?

আনিস বসার ঘরে ঢুকে বাতি জ্বেলেই সঙ্গে-সঙ্গে বাতি নিভিয়ে ফেলল। রানু বসার ঘরে ছোট টেবিলে চুপচাপ বসে আছে। তার গায়ে কোনো কাপড় নেই।

'এই রানু।'

'উঁ।'

'কী হয়েছে? তোমার কাপড় কোথায়?'

'খুলে ফেলেছি। বড্ড গরম লাগছে।'

আনিস এসে রানুর হাত ধরল। হিমশীতল হাত। একটু-একটু যেন কাঁপছে।

'এস রানু, ঘুমুতে যাই।'

'আমার ঘুমুতে ইচ্ছে করছে না। তুমি যাও।'

'কাল আমরা একজন ডাক্তারের কাছে যাব, কেমন?'

'কেন?'

'তোমার শরীর ভালো না রানু।'

'আমার শরীর ভালোই আছে।'

'না, তুমি খুব অসুস্থ। এস আমার সঙ্গে। কাপড় পরে ঘুমুতে এস।'

রানু কোনো আপত্তি করল না। সঙ্গে-সঙ্গেই উঠে এল। কাপড় পরল এবং বাধ্য মেয়ের মতো বিছানায় শুয়ে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। জেগে রইল আনিস। রানুর শরীর দ্রুত খারাপ হচ্ছে। আগে তো এ রকম কখনো হয় নি! মিসির আলি-টালি নয়, বড় কোনো ডাক্তারকে দেখানো দরকার।

খুটখুট করে শব্দ হচ্ছে রান্নাঘরে। ইঁদুরের উপদ্রব। তবু কেন জানি শব্দটা অন্য রকম মনে হচ্ছে। যেন কেউ হাঁটছে রান্নাঘরে। থপ্‌থপ্‌ শব্দও হলো কয়েক বার। আনিস বলল, 'কে?' রান্নাঘরের শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল। আনিস বলল, 'কে? কে?' মনের ভুল নাকি? আনিস যেন স্পষ্ট শুনল, রান্নাঘর থেকে কেউ-এক জন বলল, 'আমি।' স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ আওয়াজ। মেয়েলি স্বর। নাকি রানুই বলছে ঘুমের ঘোরে? এটাই হয়েছে। রানুরই গলা।

আনিস হাত বাড়িয়ে রানুকে কাছে টানল। রানু বলল, 'হাতটা সরিয়ে নাও,

গরম লাগছে।' তার মানে কি রানু জেগেছিল এতক্ষণ?

'রানু।'

'উঁ।'

'তুমি জেগেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি যখন বললাম কে কে, তখন কি তুমি বলেছ, আমি?'

রানু চুপ করে রইল। আনিস বলল, 'বল, বলেছ এ রকম কিছু?'

'হ্যাঁ, বলেছি।'

'কিন্তু তুমি জবাব দিলে কেন? তোমাকে তো কিছু জিজ্ঞেস করি নি। আমি জানতে চাচ্ছিলাম রান্নাঘরে কেউ আছে কি না।'

রানু ফিসফিস করে বলল, 'আমি তো রান্নাঘরেই ছিলাম। আমি রান্নাঘর থেকেই জবাব দিয়েছি।'

আনিস চুপ করে গেল। বিছানায় উঠে বসে পরপর দুটি সিগারেট শেষ করল। বাথরুমে গিয়ে বাতি জ্বালিয়ে রেখে এল। রান্নাঘরের বাতিও জ্বালিয়ে দিয়ে এল। থাকুক, সারা রাত বাতি জ্বালানো থাকুক।

'রানু।'

'কি?'

'কাল তুমি আমার সঙ্গে একজন ডাক্তারের কাছে যাবে, কেমন?'

'ঠিক আছে, যাব।'

'ডাক্তার সাহেব যা-যা জানতে চান, সব বলবে।'

রানু জবাব দিল না। মনে হলো সে ঘুমিয়ে পড়েছে। শান্ত নির্বিঘ্ন ঘুম কিন্তু রান্নাঘরে আবার শব্দ হচ্ছে। আনিসের মনে হলো সে স্পষ্ট চুড়ির টুনটুন শব্দ শুনছে। কাঁচের চুড়ির আওয়াজ। আনিস কয়েক বার ডাকল, 'কে, কে ওখানে?' কেউ কোনো জবাব দিল না। বাথরুম থেকে একটানা জল পড়ার শব্দ আসছে। বাড়িঅলাকে বলতে হবে কল ঠিক করে দিতে। এক জন কাজের মানুষ রাখতে হবে। পুরুষমানুষ নয়, মেয়েমানুষ—যে রাত-দিন থাকবে। আত্মীয়স্বজন কাউকে এনে রাখলে ভালো হত। কিন্তু আনিসের তেমন কোনো আত্মীয়স্বজন নেই, যারা এখানে এসে থাকবে। আনিসের ঘুম এল শেষরাতের দিকে।

মিসির সাহেবের সঙ্গে তারা প্রায় দুই ঘণ্টা সময় কাটাল।

রানু খুব সহজ-স্বাভাবিক আচরণ করল। এর প্রধান কৃতিত্ব সম্ভবত মিসির সাহেবের। তিনি খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে কথাবার্তা বললেন। এক পর্যায়ে রানু

বলল, 'আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন, আমি আপনার মেয়ের বয়সী।'

'মেয়ের বয়সী হলে কী, আমার তো মেয়ে নেই। বিয়েই করি নি।'

রানু কিছু-একটা বলতে গিয়েও বলল না। ভদ্রলোক সেটি লক্ষ্য করলেন।

'তুমি কিছু বলতে চাচ্ছিলে?'

'জ্বি-না।'

'কিছু বলতে চাইলে বলতে পার।'

'না, আমি কিছু বলব না।'

মিসির সাহেব চায়ের ব্যবস্থা করলেন। চা খেতে-খেতে নিতান্তই সহজ ভঙ্গিতে বললেন, 'আনিস সাহেব বলেছিলেন, তুমি যা স্বপ্নে দেখ তা-ই সত্যি হয়।'

'হুঁ।'

'যা স্বপ্নে দেখ তা-ই হয়?'

'শুধু স্বপ্ন না, যা আমার মনে আসে তা-ই হয়।'

'বল কী!'

'আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না, না?'

'বিশ্বাস হবে না কেন? পৃথিবীতে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার আছে। পৃথিবীটা বড় অদ্ভুত।'

বলতে-বলতে মিসির আলি ড্রয়ার খুলে চৌকা ধরনের চারটি কার্ড বের করলেন। হাসিমুখে বললেন, 'রানু, এই কার্ডগুলিতে ডিজাইন আঁকা আছে। আমি একেকটি টেবিলের ওপর রাখব, ডিজাইনগুলি থাকবে নিচে। তুমি না দেখে বলতে চেষ্টা করবে।'

রানু অবাক হয়ে বলল, 'না দেখে বলব কীভাবে?'

'চেষ্টা করে দেখ। পারতেও তো পার। বল দেখি এই কার্ডটিতে কী আঁকা আছে?'

'কী আশ্চর্য, কী করে বলব?'

'আন্দাজ কর। যা মনে আসে তা-ই বল।'

'একটা ক্রস চিহ্ন আছে। ঠিক হয়েছে?'

'তা বলব না। এবার বল এটিতে কী আছে?'

'খুব ছোট-ছোট সার্কেল।'

'ক'টি, বলতে পারবে?'

'মনে হচ্ছে তিনটি। চারটিও হতে পারে।'

মিসির সাহেব কার্ডগুলো ড্রয়ারে রেখে সিগারেট ধরালেন। তাঁকে কেমন যেন

চিন্তিত মনে হতে লাগল। আনিস বলল, 'ও কি বলতে পেরেছে?' মিসির সাহেব তার জবাব না-দিয়ে বললেন, 'রানু, এবার তুমি বল, প্রথম ভয়টা তুমি কীভাবে পেলে। সবকিছু বলবে, কিছুই বাদ দেবে না। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছি।'

রানু চুপ করে রইল।

'তুমি নিশ্চয়ই চাও, তোমার অসুখটা সেরে যাক। চাও না?'

'চাই।'

'তাহলে বল। কোনোকিছু বাদ দেবে না।'

রানু তাকাল আনিসের দিকে। মিসির আলি বললেন, 'আনিস সাহেব, আপনি না হয় পাশের ঘরে গিয়ে বসেন। ঐ ঘরে অনেক বইপত্র আছে, বসে-বসে পড়তে থাকুন। ন্যাশনাল জিওগ্রাফির কারেন্ট ইস্যুটা আছে, গতকালই এসেছে।'

রানু বলতে শুরু করল। মিসির আলি শুনতে লাগলেন চোখ বন্ধ করে। একটি প্রশ্নও জিজ্ঞেস করলেন না। মাঝখানে এক বার শুধু বললেন, 'পানি খাবে? তৃষ্ণা পেয়েছে?' রানু মাথা নাড়ল। তিনি পানির জগ এবং গ্লাস নিয়ে এলেন। শান্ত স্বরে বললেন, 'চোখে-মুখে পানি দিয়ে নাও, ভালো লাগবে।' রানু সে সব কিছুই করল না। শান্ত ভঙ্গিতে বসে রইল। কথা বলতে লাগল স্পষ্ট স্বরে।

রানুর প্রথম গল্প

আমার বয়স তখন এগার-বার বৎসর। আমি মধুপুরে আমার এক চাচার বাড়িতে বেড়াতে গেছি। চাচাতো বোনের বিয়েতে। চাচাতো বোনটির নাম হচ্ছে অনুফা। খুবই ভালো মেয়ে, কিন্তু চাচা বিয়ে ঠিক করেছেন একটা বাজে ছেলের সঙ্গে। ছেলের প্রচুর জায়গাটায়গা আছে, কিন্তু কিছুই করে না। দেখতেও বাজে, দাঁত উঁচু, মুখে বসন্তের দাগ। দারুণ বেঁটে। অনুফা আপার এই নিয়ে খুব মন-খারাপ। প্রায়ই এই নিয়ে কাঁদে। আমি তাকে সান্ত্বনাটান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমি নিজে একটি বাচ্চা মেয়ে, তাকে কী সান্ত্বনা দেব? তবে আমার সঙ্গে অনুফা আপার খুব ভাব ছিল। আমাকে অনেক গোপন কথাটথা বলত।

যাই হোক, গায়ে-হলুদের দিন খুব রঙ খেলা হলো। আমাদের ওদিকে রঙ খেলা হচ্ছে—উঠোনে কাদা ফেলে তাতে গড়াগড়ি খাওয়া। সারা দিন রঙ খেলে কাদা মেখে সবাই ভূত হয়ে গেছি। ঠিক করা হলো সবাই মিলে নদীতে গোসল সেরে আসবে। চাচা অবশ্যি আপত্তি করলেন—মেয়েছেলেরা নদীতে যাবে কী?

চাচার আপত্তি অবশ্যি টিকল না। আমরা মেয়েরা সবাই দল বেঁধে নদীতে গোসল করতে গেলাম। বাড়ি থেকে অল্প কিছু দূরেই নদী। আমরা প্রায় ত্রিশ-

চল্লিশ জন মেয়ে, খুব হৈচৈ হচ্ছে। সবাই মিলে মহানন্দে পানিতে ঝাঁপাঝাঁপি করছি। সেখানেও খুব কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হলো। ঠিক তখন একটা কাণ্ড হলো, মনে হলো একজন কে যেন আমার পা জড়িয়ে ধরেছে। নির্ঘাত কেউ তামাশা করছে। আমি হাসতে-হাসতে বললাম—এ্যাই, ভালো হবে না। ছাড় বলছি, ছাড়। কিন্তু যে পা ধরেছে সে ছাড়ল না, হঠাৎ মনে হলো সে টেনে আমার পায়জামাটা খুলে ফেলতে চেষ্টা করছে। তখন আমি চিৎকার দিলাম। সবাই মনে করল কোনো-একটা তামাশা হচ্ছে। কেউ কাছে এল না, কিন্তু ততক্ষণে আমার পায়জামাটা খুলে ফেলেছে আর, আর....।

[এই সময় মিসির সাহেব বললেন, 'বুঝতে পারছি তারপর কী হলো।']

সবার প্রথম অনুফা আপা ছুটে এসে আমাকে ধরলেন, তারপর অন্যরা ছুটে এল। যে আমার পা জড়িয়ে ধরেছিল, সে আমাকে শক্ত করে চেপে ধরে গভীর জলের দিকে টেনে নিতে লাগল। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হবার পর শুনেছি ওরা আমাকে বহু কষ্টে টেনে পাড়ে তুলেছে এবং দেখেছে একটা মরা মানুষ আমাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। ঐ মরা মানুষটাকে গ্রামের লোকেরা নদীর পাড়ে মাটি চাপা দিয়েছিল। সেইসব কিছুই অবশ্যি আমি দেখি নি, শুনেছি। কারণ আমার কোনো জ্ঞান ছিল না। চাচা আমার চিকিৎসার জন্যে আমাকে ঢাকা নিয়ে এসেছিলেন। সবাই ধরে নিয়েছিল আমি বাঁচব না, কিন্তু বেঁচে গেলাম। এইটুকু আমার প্রথম ভয়ের গল্প।

রানু গল্প শেষ করে পুরো এক গ্লাস পানি খেল। মিসির আলি সাহেব বললেন, 'ঐ লোককে তুমি দেখ নি?'

'জ্বি-না।'

'গ্রামের অন্যরা তো দেখেছে, কী রকম ছিল দেখতে?'

'আমি জানি না, কাউকে জিজ্ঞেস করি নি। কেউ আমাকে কিছু বলে নি।'

'এর পর কি তুমি কখনো তোমার চাচার বাড়ি গিয়েছিলে?'

'জ্বি-না, কখনো যাই নি।'

'আরেকটা কথা তুমি বলছিলে। ঐ লোকটি তোমার পায়জামা টেনে খুলে ফেলতে চেষ্টা করছিল। তোমাকে যখন টেনে তোলা হলো তখন কি পায়জামা পরনে ছিল?'

'জ্বি-না, ছিল না।'

মিসির আলি সাহেব সিগারেট ধরিয়ে নিচু গলায় বললেন, 'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে কোনো একটি জিনিস তুমি আমাকে বল নি। কিছু-একটা বাদ দিয়ে গেছ।'

রানু জবাব দিল না।

'যে জিনিসটা বাদ দিয়েছ, সেটা আমার শোনা দরকার। সেটা কী, বলবে?'

'অন্য আরেক দিন বলব।'

'ঠিক আছে, অন্য এক দিন শুনব। তোমাকে আসতে হবে না, আমি গিয়ে শুনে আসব।'

রানু কিছু বলল না। মিসির আলি সাহেব কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে থেকে হঠাৎ বললেন, 'যখন তুমি একা থাক, তখন কি কেউ তোমার সঙ্গে কথা বলে?'

'হ্যাঁ।'

মিসির আলি খুব উৎসাহ বোধ করলেন।

'ব্যাপারটা গুছিয়ে বল।'

'মাঝে-মাঝে কে যেন আমাকে নাম ধরে ডাকে।'

'পুরুষদের গলায়?'

'জ্বি-না। মেয়েদের গলায়।'

'শুধু ডাকে, অন্য কিছু বলে না?'

'জ্বি-না।'

'এবং যে ডাকে তাকে কখনো দেখা যায় না?'

'জ্বি-না।'

'এটা প্রথম কখন হয়? অর্থাৎ প্রথম কখন শুনলে? নদীর ব্যাপারটা ঘটার আগেই?'

'হুঁ।'

'কত দিন আগে?'

'আমার ঠিক মনে নেই।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, আজ এই পর্যন্তই।'

রানুরা উঠে দাঁড়াল। মিসির আলি ভারি গলায় বললেন, 'আবার দেখা হবে।' রানু কিছু বলল না। আনিস বলল, 'আমরা তাহলে যাই?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

মিসির আলি ওদের রিকশা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। ওরা রিকশায় উঠবার সময় তিনি হঠাৎ বললেন, 'রানু, যে তোমার পা জড়িয়ে ধরেছিল, ওর নাম কী?'

'ওর নাম জালালউদ্দিন।'

'কি করে জানলে, ওর নাম জালালউদ্দিন?'

রানু তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না। মিসির আলি সাহেব বললেন, 'ঠিক আছে, পরে কথা হবে।'

রিকশায় ওরা দুই জনে কোনো কথা বলল না। আনিসের এক বার মনে হলো, রানু কাঁদছে। সে সিগারেট ধরিয়ে সহজ স্বরে বলল, 'ভদ্রলোককে তোমার কেমন লাগল রানু?'

'ভালো। বেশ ভালো লোক। উনি আসলে কী করেন?'

'উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পার্ট-টাইম টীচার। ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াট্রি পড়ান। খুব জ্ঞানী লোক।'

'ইউনিভার্সিটির টীচাররা এমন রোগা হয়, তা তো জানতাম না! আমার ধারণা ছিল তাঁরা খুব মোটাসোটা হন।'

রানু শব্দ করে হাসল। আনিস বলল, 'আজ বাইরে খাওয়া-দাওয়া করলে কেমন হয়?'

'শুধু-শুধু টাকা খরচ।'

'তোমার গিয়ে রান্না চড়াতে হবে না। চল না, কিছু পয়সা খরচ হোক।'

'কোথায় খাবে?'

'আছে আমার একটা চেনা জায়গা। নানরুটি আর কাবাব। কি বল?'

৬

মিসির আলি সাহেব দেখলেন তাঁর ঘরের সামনে চারটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনো টিউটোরিয়েল ক্লাস আছে নাকি? আজ বুধবার, টিউটোরিয়েল ক্লাস থাকার কথা নয়। তবে কে জানে হয়তো নতুন রুটিন দিয়েছে। তিনি এখনো নোটিস পান নি।

'এই, তোমাদের কী ব্যাপার?'

মেয়েগুলো জড়সড় হয়ে গেল।

'কি, তোমাদের সঙ্গে কোনো ক্লাস আছে?'

'জ্বি-না স্যার।'

'তাহলে কি? কিছু বলবে?'

'স্যার, নোটিস-বোর্ডে আপনি একটা নোটিস দিয়েছিলেন, সেই জন্যে এসেছি।'

'কিসের নোটিস?'

তিনি ভুরু কোঁচকালেন। মেয়েগুলো মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

'কী নোটিস দিয়েছিলাম?'

'স্যার, আপনি লিখেছেন—কারো এক্সট্রাসেন্সরি পারসেপশনের ক্ষমতা আছে কি না আপনি পরীক্ষা করে বলে দেবেন।'

মিসির আলি সাহেবের সমস্ত ব্যাপারটা মনে পড়ল। মাস দুয়েক আগে এ রকম একটা নোটিস দিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু এই প্রথম চার জনকে পাওয়া গেল, যারা উৎসাহী এবং সব ক'টি মেয়ে। মেয়েগুলো রোগা। তার মানে কি অকল্টের ব্যাপারে রোগা মেয়েরাই বেশি উৎসাহী? তিনি মনে-মনে একটা নোট তৈরি করলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে হলো বিষয়টি ইন্টারেস্টিং। একটা সার্ভে করা যেতে পারে।

'এস তোমরা। ঘরে এস। তোমরা তাহলে জানতে চাও তোমাদের ইএসপি আছে কি না?'

মেয়েগুলো কথা বলল না। যেন একটু ভয় পাচ্ছে। মুখ সবারই শুকনো।

'বস তোমরা। চেয়ারে আরাম করে বস।'

ওরা বসল। মিসির আলি সাহেব একটা সিগারেট ধরালেন। নিচু গলায় বললেন, 'সব মানুষের মধ্যেই ইএসপি কিছু পরিমাণ থাকে। টেলিপ্যাথির কথাই ধর। তোমাদের নিজেদেরই হয়তো এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। সহজ উদাহরণ হচ্ছে, ধর, এক দিন তোমাদের কারো মনে হলো আজ অমুকের সাথে দেখা হবে। যার সঙ্গে দেখা হবার কথা মনে হচ্ছে, সে কিন্তু এখানে থাকে না। থাকে চিটাগাং। কিন্তু সত্যি-সত্যি দেখা হয়ে গেল। কি, হয় না এ রকম?'

মেয়েগুলো কথা বলল না। এর মধ্যে এক জন রুমাল দিয়ে কপাল মুছতে লাগল। মেয়েটি ঘামছে। নার্ভাস হয়ে পড়ছে মনে হয়। নিশ্চয়ই ব্লাড-প্রেশার বেড়ে গেছে। মিসির আলি বিস্মিত হলেন। নার্ভাস মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই বিষয়ে চর্চা এখনো বিজ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে না। বেশির ভাগ সিদ্ধান্তই অনুমানের ওপর। তবে আমেরিকায় একটি ইউনিভার্সিটি আছে—ডিউক ইউনিভার্সিটি। ওরা কিছু-কিছু এক্সপেরিমেন্টাল কাজ শুরু করেছে। মুশকিল হচ্ছে, ফলাফল সবসময় রিপ্রডিউসিবল্ নয়।'

মিসির আলি সাহেব ড্রয়ার খুলে দশটি চৌকো কার্ড টেবিলে বিছালেন। হাসিমুখে বললেন, 'পরীক্ষাটি খুব সহজ। এই কার্ডগুলোতে বিভিন্ন রকম চিহ্ন আছে। যেমন ধর ক্রস, স্কয়ার, ত্রিভুজ, বিন্দু। কোনটিতে কী আছে সেটা অনুমান করতে চেষ্টা করবে। দুই এক বার কাকতালীয়ভাবে মিলে যাবে। তবে ফলাফল যদি স্ট্যাটিসটিক্যালি সিগনিফিকেন্ট হয়, তাহলে বুঝতে হবে তোমাদের ইএসপি আছে। এখন এস দেখি, কে প্রথম বলবে? তোমার কী নাম?'

'নীলুফার।'

'হ্যাঁ নীলুফার, তুমিই প্রথম চেষ্টা কর। যা মনে আসে তা-ই বল।'

'আমার কিছু মনে আসছে না।'

'তাহলে অনুমান করে বল।'

মেয়েটি ঠিকমতো বলতে পারল না। তার সঙ্গীরাও না। মিসির আলি হাসতে-হাসতে বললেন, 'নাহ্, তোমাদের কারো কোনো ইএসপি নেই।'ওরা যেন তাতে খুশিই হলো। মিসির আলি গম্ভীর গলায় বললেন, 'না থাকাই ভালো। আধুনিক মানুষদের এ সব থাকতে নেই। এতে অনেক রকম জটিলতা হয়।'

'কী জটিলতা?'

'আছে, আছে।'

'বলুন না স্যার।'

মিসির আলি লক্ষ্য করলেন, নীলুফার নামের মেয়েটিই কথা বলছে। স্পষ্ট সতেজ গলা।

'অন্য আরেক দিন বলব। আজ তোমরা যাও।'

নীলুফার বলল, 'এমন কিছু কি স্যার আছে, যা করলে ইএসপি হয়?'

'লোকজন বলে, প্রেমে পড়লেও এই ক্ষমতাটা অসম্ভব বেড়ে যায়। আমি ঠিক জানি না। তোমরা যদি কেউ কখনো প্রেমে পড়, তাহলে এস, পরীক্ষা করে দেখব।'

কথাটা বলেই মিসির আলি অপ্রস্তুত বোধ করলেন। ছাত্রীদের এটা বলা ঠিক হয় নি। কথাবার্তায় তাঁর আরো সাবধান হওয়া উচিত। এ রকম হালকা ভঙ্গিতে কথা বলা ঠিক হচ্ছে না।

'স্যার, আমরা যাই?'

'আচ্ছা ঠিক আছে, দেখা হবে।'

মিসির আলি নিচের টীচার্স লাউঞ্জে চা খেতে এলেন। বেলা প্রায় তিনটা। লাউঞ্জে লোকজন নেই। পলিটিক্যাল সায়েন্সের রশিদ সাহেব এক কোণায় বসেছিলেন। তিনি অস্পষ্ট স্বরে ডাকলেন, 'এই যে মিসির সাহেব, অনেক দিন পর মনে হয় এলেন এদিকে। চা খাবেন?'

'কে যেন বলছিল, আপনি নাকি ভূতে-ধরা সারাতে পারেন। ঠিক নাকি?'

'জ্বি-না। আমি ওঝা নই।'

'রাগ করলেন নাকি? আমি কথার কথা বললাম।'

'না, রাগ করব কেন?'

'আচ্ছা মিসির আলি সাহেব, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?'

'না।'

রশিদ সাহেব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

'আত্মা, আত্মায় বিশ্বাস করেন?'

'না ভাই, আমি একজন নাস্তিক।'

'আত্মা নেই—এই জিনিসটা কি প্রমাণ করতে পারবেন? কী কী যুক্তি আছে আপনার হাতে?'

মিসির আলি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। রশিদ সাহেব বললেন, 'আত্মা যে আছে, এর পক্ষে বিজ্ঞানীদের কিছু চমৎকার যুক্তি আছে।'

'থাকলে তো ভালোই। বিজ্ঞানীরা জড়জগৎ বাদ দিয়ে আত্মাটাত্মা নিয়ে উৎসাহী হলেই কিন্তু ঝামেলা। রশিদ সাহেব, আমার মাথা ধরেছে। এ নিয়ে আর কথা বলতে চাই না। কিছু মনে করবেন না।'

মিসির আলি চা না খেয়েই উঠে পড়লেন। তাঁর সত্যি-সত্যি মাথা ধরেছে। প্রচণ্ড ব্যথা। বড় রকমের কোনো অসুখের একটা পূর্বলক্ষণ।

৭

নীলু ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে এসে দেখে তার বিছানার উপর চমৎকার একটি প্যাকেট পড়ে আছে। ব্রাউন কাগজে মোড়া প্যাকেটে গোটা-গোটা করে তার নাম লেখা। নীলুর বুক কেঁপে উঠল, বিলুর চোখে পড়ে নি তো? বিলুর খুব খারাপ অভ্যাস আছে, অন্যের চিঠি খুলে-খুলে পড়বে। হাসাহাসি করবে।

নীলু দরজা বন্ধ করেই প্যাকেটটি খুলল। ছোট্ট চিঠি, কিন্তু কী চমৎকার করেই না লেখা :

কল্যাণীয়াসু,
ইচ্ছা করেই তোমাকে আমি কম লিখি। তোমার চিঠি পড়ে-পড়ে খুব মায়া জন্মে যায়। এ বয়সে আমার আর মায়া বাড়াতে ইচ্ছা করে না। মায়া বাড়ালেই কষ্ট পেতে হয়। আরেকটি সামান্য উপহার পাঠালাম। গ্রহণ করলে খুব খুশি হব।

আহমেদ সাবেত

উপহারটি বড় সুন্দর! নীল রঙের একটি ডায়েরি। অসম্ভব নরম প্লাস্টিকের কভার, যেখানে ছোট্ট একটি শিশুর ছবি। পাতাগুলো হালকা গোলাপী। প্রতিটি পাতায় সুন্দর-সুন্দর দুই লাইনের কবিতা। ডায়েরিটির প্রথম পাতায় ইংরেজিতে লেখা ঃ

'I wish I could be eighteen again'

A. S.

পড়তে গিয়ে কেন জানি নীলুর চোখে জল এল। এক জন সম্পূর্ণ অজানা-

অচেনা মানুষের জন্যে মন কেমন করতে লাগল। লোকটি দেখতে কেমন কে জানে? সুন্দর নয় নিশ্চয়ই। বয়স্ক মানুষ, হয়তো চুলটুল পেকে গেছে। তাতে কিছু যায় আসে না। মানুষের বয়স হচ্ছে তার মনে। মন যত দিন কাঁচা থাকে, তত দিন মানুষের বয়স বাড়ে না। এই লোকটির মন অসম্ভব নরম। শিশুর মতো নরম। নীলুর মনে হলো এই লোকটি স্বামী হিসেবে অসাধারণ ছিল। তার স্ত্রীকে সে নিশ্চয়ই সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছে।

নীলু রাতের বেলা দরজা বন্ধ করে দীর্ঘ একটা চিঠি লিখল—আপনি এমন কেন? নিজের কথা তো কিছুই লেখেন নি! অথচ আমি আমার সমস্ত কথা লিখে বসে আছি। তবু মনে হয় সব বুঝি লেখা হলো না। অনেক কিছু বুঝি বাকি রয়ে গেল। আপনি আমাকে এত সুন্দর-সুন্দর উপহার দিয়েছেন, কিন্তু আমি তো আপনাকে কিছুই দিই নি। আমার কিছু-একটা দিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু আমি তো জানি না আপনি কী পছন্দ করেন। আচ্ছা, আপনি কি টাই পরেন? তাহলে লাল টকটকে একটা টাই আপনাকে দিতে পারি। জানেন, পুরুষমানুষের এই একটি জিনিসই আমি পছন্দ করি। কিন্তু হয়তো আপনি টাই পরেন না, ঢিলেঢালা ধরনের মানুষদের মতো চাদর গায়ে দেন। আপনার সম্পর্কে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। এক দিন আসুন না আমাদের বাসায়, এক কাপ চা খেয়ে যাবেন। জানেন, আমি খুব ভালো চা বানাতে পারি। অন্য কেউ চা বানিয়ে দিলে আমার বাবা খেতে পারেন না। সব সময় আমাকে বানাতে হয়। গত রোববারে কী হলো, জানেন? রাত তিনটেয় বাবা আমাকে ডেকে তুলে বললেন—মা, এক কাপ চা বানা তো, বড্ড চায়ের তৃষ্ণা পেয়েছে।

'আপা, দরজা বন্ধ করে কী করছ?'

নীলু অপ্রস্তুত হয়ে দরজা খুলল। বিলু দাঁড়িয়ে আছে। সন্দেহজনকভাবে তাকাচ্ছে।

'কী করছিলে?'

'কিছু করছিলাম না।'

বিলু বিছানায় এসে বসল, 'আপা, তোমার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি।'

'কী পরিবর্তন?'

'অস্থির-অস্থির ভাব। লক্ষণ ভালো না আপা। বল তো কী হয়েছে?'

'কী আবার হবে? তোর শুধু উল্টোপাল্টা কথা।'

'কিছু-একটা হয়েছে আপা। আমি জানি।'

'কী যে বলিস!'

'আমার কাছে লুকোতে পারবে না আপা। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া মুশকিল।'

'যা ভাগ, পাকামো করিস না।'

বিলু গেল না। কাপড় ছাড়তে-ছাড়তে বলল, 'রানু আপাকেও আমি বললাম তোমার পরিবর্তনের কথা। তারও ধারণা, তুমি কারো প্রেমে পড়েছ।'

'হুঁ, আমার তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই। তা ছাড়া প্রেমটা আমার সঙ্গে করবে কে? চেহারার এই তো অবস্থা।'

'খারাপ অবস্থাটা কী? রঙটা একটু ময়লা। এ ছাড়া আর কি?'

নীলু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল।

'নিঃশ্বাস ফেলছ কেন আপা? নিজের চেহারা সম্পর্কে তোমার এমন খারাপ ধারণা থাকা উচিত না। সবাই তো আর রানু আপার মতো হয় না, হওয়া উচিত নয়।'

'উচিত নয় কেন?'

'সুন্দরী মেয়েদের অনেক রকম প্রবলেম থাকে।'

'কী প্রবলেম?'

'রানু আপার মাথা খারাপ—সেটা তুমি জান?'

'কী বলছিস এ সব!'

'ঠিকই বলছি। আকবরের মা একদিন দুপুরে কি জন্যে যেন গিয়েছিল, শোনে রানু আপা নিজের মনে হাসছে এবং কথা বলছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। কথাগুলো বলছে আবার দুই রকম গলায়। আকবরের মা প্রথম ভেবেছিল কেউ বোধহয় বেড়াতে এসেছে। শেষে ঘরে ঢুকে দেখে কেউ নেই।'

'সত্যি?'

'হুঁ। রহমান সাহেবের স্ত্রী বললেন, একদিন নাকি আনিস সাহেব গভীর রাতে রহমান সাহেবকে ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর স্ত্রীর খুব অসুখ, এই কথা বলে। রহমান সাহেব গিয়ে দেখেন অসুখটসুখ কিছু নেই, দিব্যি ভালো মানুষ।'

নীলু মৃদু স্বরে বলল, 'রানুর মতো সুন্দরী হলে আমি পাগল হতেও রাজি।'

বিলু হেসে ফেলল। হাসতে-হাসতে বলল, 'কথাটা ঠিক বলেছ আপা।'

রানু প্রসঙ্গে পাওয়া সব তথ্য লিখে রাখবার জন্যে মিসির আলি সাহেব মোটা একটা খাতা কিনে এনেছেন। খাতাটির প্রথম পাতায় লেখা—

'এক জন মানসিক রুগীর পর্যায়ক্রমিক মনোবিশ্লেষণ।' দ্বিতীয় পাতায় কিছু

ব্যক্তিগত তথ্য। যেমন—

নাম : রানু আহমেদ।

বয়স : সতের বৎসর (রূপবতী)।

বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিতা। (তের মাস আগে বিয়ে হয়)।

স্বাস্থ্য : রুগ্ণা।

ওজন : আশি পাউন্ড।

স্বামী : আনিস আহমেদ। দি জেনিথ ইন্টারন্যাশনালের ডিউটি অফিসার। বয়স ৩৭। স্বাস্থ্য ভালো।

তৃতীয় পাতার হেডিংটি হচ্ছে—'অডিটরি হেলুসিনেশন'। এর নিচে লাল কালি দিয়ে একটা বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন আঁকা। এই পাতায় অনেক কিছুই লেখা হয়েছে, আবার কাটাকুটি করা হয়েছে। যেন মিসির আলি সাহেব মনস্থির করতে পারছেন না কী লিখবেন। দুটি লাইন শুধু পড়া যায়। লাইন দুটির নিচে লাল কালি দিয়ে দাগ দেয়া।

'মেয়েটি অডিটরি হেলুসিনেশন হচ্ছে : সে একা থাকাকালীন শুনতে পায় কেউ যেন তাকে ডাকছে।'

পরের কয়েকটি পাতায় রানুর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয় লেখা। এ পাতাগুলো পড়লেই বোঝা যায়, মিসির আলি নামের এই লোকটির স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। অতি তুচ্ছ ব্যাপারগুলোও লেখা আছে। যেমন, এক জায়গায় লেখা—মেয়েটি বেশ কয়েক বার শাড়ির আঁচল টেনেছে। দুই বার শব্দ করে আঙুল ফুটিয়েছে। আমি লক্ষ্য করলাম মেয়েটি পানি খেল মাথা নিচু করে। বেশ খানিকটা নিচু করে। যেন পানি পান করার ব্যাপারটি সে আড়াল করতে চায়।

নদীতে গোসলের গল্পটি লেখা আছে। গল্পের শেষে বেশ কিছু প্রশ্ন করা আছে। যেমন—

★ এক জন মৃত মানুষ পানিতে ভেসে থাকবে। ডুবে থাকবে না। গল্পে মৃত মানুষটির ডুবে-ডুবে চলার কথা আছে। এ রকম থাকার কথা নয়।

★ পাজামা খুলে ফেলার কথা আছে। কিশোরীরা সাধারণত শক্ত গিট দিয়ে পাজামা পরে। গিট খুলতে হলে ফিতা টানতে হবে। ঐ মানুষটি কি ফিতা টেনেছিল, না পাজামাটাই টেনে নামিয়েছে?

★ মৃত লোকটির কি কোনো পোস্ট মর্টেম হয়েছিল?

★ তার আনুমানিক বয়স কত ছিল?

★ প্রথম অসুস্থতার সময় কি মেয়েটি ঘুমের মধ্যে কোনো কথাবার্তা বলত? কী বলত?

★ মেয়েটি বলল, লোকটির নাম জালালউদ্দিন। কীভাবে বলল? লোকটির নাম তো জানার কথা নয়। নাকি পরে শুনেছে?

★ জালালউদ্দিন-জাতীয় নামের কারো সঙ্গে কি এই মেয়েটির পূর্বপরিচয় ছিল?

প্রশ্নের শেষে তিনটি মন্তব্য লেখা আছে। মন্তব্যগুলো সংক্ষিপ্ত। প্রথম মন্তব্য– মেয়েটি যে ঘটনার কথা বলেছে, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। দ্বিতীয় মন্তব্য– এই ঘটনা অন্য যেসব ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করেছে তাদের সঙ্গে প্রথমে আলাপ করতে হবে। দ্বিতীয় মন্তব্যটি লাল কালি দিয়ে আন্ডারলাইন করা ও পাশে লেখা—অত্যন্ত জরুরি। তৃতীয় মন্তব্য—মেয়েটির অবশ্যই কিছু পরিমাণ এক্সট্রাসেন্সরি পারসেপশন আছে। সে কার্ডের সব ক'টি চিহ্ন সঠিকভাবে বলতে পেরেছে। আমি এ রকম আগে কখনো দেখি নি। এই বিষয়ে আমার ধারণা হচ্ছে, মানসিকভাবে অসুস্থ রুগীদের এই দিকটি উন্নত হয়ে থাকে। আমি এর আগেও যে ক'টি অসুস্থ মানুষ দেখেছি, তাদের সবার মধ্যেই এই ক্ষমতাটি কিছু পরিমাণে লক্ষ্য করেছি। দি জার্নাল অব প্যারাসাইকোলজির তৃতীয় ভল্যুমে (১৯৭৩) এই প্রসঙ্গে রিভিউ পেপার আছে। অথর জন নান এবং এফ টলম্যান।

৮

সোহাগী হাইস্কুলের হেডমাষ্টার সাহেব দারুণ অবাক হলেন। রানুর ব্যাপারে খোঁজখবর করার জন্যে এক ভদ্রলোক এসেছেন—এর মানে কী? অতো দিন আগে কী হয়েছিল, না-হয়েছিল, তা কি এখন আর কারো মনে আছে? আর মনে থাকলেও এইসব ব্যাপার নিয়ে এখন ঘাঁটাঘাঁটি করাটা বোধহয় ঠিক নয়। কিন্তু যে ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁকে মুখের ওপর না বলতেও বাধছে। ভদ্রলোক হাজার হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন শিক্ষক। মানী লোক। তা ছাড়া এত দূর এসেছেন, নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। মুখে বলছেন রানু অসুস্থ এবং তিনি রানুর এক জন চিকিৎসক, কিন্তু এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। কারণ মাসখানেক আগেই রানুকে তিনি দেখে এসেছেন। কিছুমাত্র অসুস্থ মনে হয় নি। আজ হঠাৎ এমন কী হয়েছে যে ঢাকা থেকে এই ভদ্রলোককে আসতে হলো?

'রানুর কী হয়েছে বললেন?'

'মানসিকভাবে অসুস্থ।'

'আমি তো সেদিনই তাকে দেখে এলাম।'

'যখন দেখেছেন তখন হয়তো সুস্থই ছিল।'

'কী জানতে চান আপনি, বলেন।'

'নদীতে গোসলের সময় কী ঘটেছিল, সেটা বলেন।'

'সে সব কি আর এখন মনে আছে?'

'ঘটনাটা বেশ সিরিয়াস এবং নিশ্চয়ই আপনাদের মধ্যে বহু বার আলোচিত হয়েছে, কাজেই মনে থাকার কথা। আপনার যা মনে আসে তাই বলেন।'

হেডমাস্টার গম্ভীর স্বরে ঘটনাটা বললেন। রানুর গল্পের সঙ্গে তাঁর গল্পের কোনো অমিল লক্ষ্য করা গেল না। শুধু ভদ্রলোক বললেন, 'মেয়েরা গোসল করতে গিয়েছিল দুপুরে, সন্ধ্যায় নয়।'

'পায়জামা খোলার ব্যাপারটি বলেন। পায়জামাটা কি পাওয়া গিয়েছিল?'

'আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না।'

'রানু বলছিল, নদীতে গোসল করবার সময় সেই মরা মানুষটি তার পায়জামা খুলে ফেলে।'

'আরে না না, কী বলেন!'

'ওর পরনে পায়জামা ছিল?'

'হ্যাঁ, থাকবে না কেন?'

'আপনার ঠিক মনে আছে তো?'

'মনে থাকবে না কেন? পরিষ্কার মনে আছে। আপনি অন্য সবাইকেও জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।'

'ঐ মরা মানুষটি সম্পর্কে কী জানেন?'

'কিছুই জানি না রে ভাই। থানায় খবর দিয়েছিলাম। থানা হচ্ছে এখান থেকে দশ মাইল। সেই সময় যোগাযোগব্যবস্থা ভালো ছিল না। থানাঅলারা আসে দুই দিন পরে। লাশ তখন পচে-গলে গিয়েছে। শিয়াল-কুকুর কামড়াকামড়ি করছে। থানাঅলারা এসে আমাদের লাশ পুঁতে ফেলতে বলে। আমরা নদীর ধারেই গর্ত করে পুঁতে ফেলি।'

'আচ্ছা, ঐ লাশটি তো উলঙ্গ ছিল, ঠিক না?'

'জ্বি-না, ঠিক না। হলুদ রঙের একটা প্যান্ট ছিল আর গায়ে গেঞ্জি ছিল।'

মিসির সাহেবের ভুরু কুঞ্চিত হলো।

'আপনার ঠিক মনে আছে তো ভাই?'

'আরে, এটা মনে না-থাকার কোনো কারণ আছে? পরিষ্কার মনে আছে।'

'লাশটি কি বুড়ো মানুষের ছিল?'

'জ্বি-না, জোয়ান মানুষের লাশ।'

'আর কিছু মনে পড়ে?'

'আর কিছু তো নেই মনে পড়ার।'

'আপনার ঐ মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে চাই, অনুফা যার নাম। শুনেছি ওর শ্বশুরবাড়ি কাছেই।'

'হরিণঘাটায়। আপনি যেতে চান হরিণঘাটা?'

'জ্বি।'

'কখন যাবেন?'

'আজকেই যেতে পারি। কত দূর এখান থেকে?'

'পনের মাইল। বেবিট্যাক্সি করে যেতে পারেন।'

'রাতে ফিরে আসতে পারব?'

'তা পারবেন।'

'বেশ, তাহলে আপনি আমাকে ঠিকানা দিন।'

'দেব। বাড়িতে চলেন, খাওয়াদাওয়া করেন।'

'আমি হোটেল থেকে খেয়েদেয়ে এসেছি।'

'তা কি হয়, অতিথি-মানুষ! আসুন আসুন।'

ভদ্রলোক বাড়িতে নিয়ে গেলেন ঠিকই, কিন্তু বড়ই গম্ভীর হয়ে রইলেন। মাথার ওপর হঠাৎ এসে পড়া উপদ্রবে তাঁকে যথেষ্ট বিরক্ত মনে হলো। ভালো করে কোনো কথাই বললেন না। অকারণে বাড়ির এক জন কামলার ওপর প্রচণ্ড হম্বিতম্বি শুরু করলেন।

কিন্তু অনুফার বাড়িতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার ঘটল। মেয়েটি আদর-যত্নের একটি মেলা বাধিয়ে ফেলল। মিসির আলি অবাক হয়ে দেখলেন, মেয়েটির স্বামী সন্ধ্যাবেলাতেই জাল নিয়ে পুকুরে নেমে গেছে। অনুফা পরিচিত মানুষের মতো আদুরে গলায় বলল, 'রাতে ফিরবেন কি—কাল সকালে যাবেন।' লোকজন মিসির আলিকে দেখতে এল। এরা বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। মেয়েটিও মনে হয় বেশ ক্ষমতা নিয়ে আছে। সবাই তার কথা শুনছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তাঁকে গোসলের জন্যে গরম পানি করে দেয়া হলো। একটা বাটিতে নতুন একটা গায়ে মাখার সাবান। মোড়কটি পর্যন্ত ছেঁড়া হয় নি। বাংলাঘরে নতুন চাদর বিছিয়ে বিছানা করা হলো। মেয়েটির বৃদ্ধ শ্বশুর একটি ফর্সী হুক্কাও এনে দিলেন এবং বারবার বলতে লাগলেন, খবর না-দিয়ে আসার জন্যে ঠিকমতো খাতির-যত্ন করতে না পেরে তিনি বড়ই শরমিন্দা। তবে যদি কালকের দিনটা থাকেন, তবে তিনি হরিণঘাটার বিখ্যাত মাগুর মাছ খাওয়াবেন। খাওয়াতে না-পারলে তিনি বাপের ব্যাটা না—ইত্যাদি ইত্যাদি।

মিসির আলির বিস্ময়ের সীমা রইল না। তিনি সত্যি-সত্যি এক দিন থেকে গেলেন। মিসির আলি সাহেব এ রকম কখনো করেন না।

৯

রানু মৃদু স্বরে বলল, 'ভেতরে আসব?'

'এস রানু, এস।'

'গল্প করতে এলাম।'

'খুব ভালো করেছ।'

নীলু উঠে গিয়ে রানুর হাত ধরল। রানু বলল, 'তুমি কাঁদছিলে নাকি, চোখ ভেজা!' নীলু কিছু বলল না। রানু বলল, 'এত কিসের দুঃখ তোমার যে দুপুরবেলায় কাঁদতে হয়?'

'তোমার বুঝি কোনো দুঃখটুঃখ নেই?'

'উঁহু। আমি খুব সুখী।'

রানু হাসতে লাগল। নীলু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, 'তুমি বলেছিলে, একটা খুব অদ্ভুত কথা আমাকে বলবে।'

'বলেছিলাম নাকি?'

'হ্যাঁ। আজ সেটা বলতে হবে। তারপর আমি আমার একটা অদ্ভুত কথা বলব।'

রানু হাসতে লাগল।

'হাসছ কেন রানু?'

'তোমার অদ্ভুত কথাটা আমি জানি, এই জন্যে হাসছি।'

'কী আবোলতাবোল বলচ! তুমি জানবে কী?'

'জানি কিন্তু।'

নীলু গম্ভীর হয়ে বলল, 'জানলে বল তো।'

'তোমার এক জন প্রিয় মানুষ তোমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছে। ঠিক না?'

নীলু দীর্ঘ সময় কোনো কথাবার্তা বলল না। রানু বলল, 'কি ভাই, বলতে পারলাম তো?'

'হ্যাঁ, পেরেছ।'

'ও কি বাসায় আসবে?'

'বলব তোমাকে। তার আগে তুমি বল, তুমি কী করে জানলে? বিলু তোমাকে বলেছে? কিন্তু বিলু তো কিছু জানে না!'

'আমাকে কেউ কিছু বলে নি।'

'তাহলে তুমি জানলে কী করে?'

'আমি স্বপ্ন দেখেছি?'

'স্বপ্ন দেখেছি মানে?'

'নীলু, মাঝে-মাঝে আমি স্বপ্ন দেখি। সেগুলো ঠিক স্বপ্নও নয়। তবে অনেকটা স্বপ্নের মতো। সেগুলো সব সত্যি। গত রাতে স্বপ্নে দেখলাম, তুমি একটি চিঠি পেয়ে খুব খুশি। সেই চিঠিতে একটি লাইন লেখা আছে, যার মানে হচ্ছে—তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে বা এই রকম কিছু।'

'এসব কি তুমি সত্যি-সত্যি বলছ রানু?'

'হ্যাঁ। কবে তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে?'

'আজ বিকেলে। আমি নিউ মার্কেটের বইয়ের দোকানের সামনে একটা সবুজ রুমাল হাতে দাঁড়িয়ে থাকব। তিনি আমাকে খুঁজে বের করবেন।'

'বাহ্‌, খুব মজার ব্যাপার তো!'

রানু হাসতে লাগল। এক সময় হাসি থামিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'শুধু গল্প-উপন্যাসেই এসব হয়। বাস্তবে এই প্রথম দেখছি। তোমার ভয় করছে না?'

'ভয় করবে কেন?'

'তোমার কিন্তু নীলু ভয় করছে। আমি বুঝতে পারছি। বেশ ভয় করছে। করছে না?'

'নাহ্‌।'

রানু ইতস্তত করে বলল, 'ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পার। আমি দূরে থাকব।'

'থাক, দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।'

মনে হলো নীলু রানুর কথাবার্তা সহজভাবে নিতে পারছে না। তার চোখ-মুখ গম্ভীর। রানু বলল, 'কি, নেবে?'

'না। আমার একা যাবার কথা, একাই যাব।'

'আর যদি গিয়ে দেখ, খুব বাজে ধরনের একটা লোক। তখন কী করবে?'

'বাজে ধরনের লোক মানে?'

'অর্থাৎ যদি গিয়ে দেখ দাঁত পড়া, চুল পাকা এক বুড়ো?'

'তোমার কি সে রকম মনে হচ্ছে?'

রানু মাথা দুলিয়ে হাসল, কিছু বলল না। নীলুকে দেখে মনে হলো রানুর ব্যবহারে সে বেশ বিরক্ত হচ্ছে। দুটো বাজতেই সে বলল, 'এবার তুমি যাও, আমি সাজগোজ করব।'

'এখনই? চারটা বাজতে তো দেরি আছে।'

'তোমার মতো সুন্দরী তো আমি না। আমাকে সময় নিয়ে সাজতে হবে।'

রানু উঠে পড়ল। নীলু সত্যি সাজতে বসল। কিন্তু কী যে হয়েছে তার, চোখে

পানি এসে কাজল ধুয়ে যাচ্ছে। আইল্যাশ পরার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু একা-একা পরা সম্ভব নয়। অনেক বেছেটেছে একটা শাড়ি পছন্দ করল। সাদার ওপর নীলের একটা প্রিন্ট। আগে সে কখনো পরে নি।

'নীলু মা, কোথাও যাচ্ছ নাকি?'

নীলু তাকিয়ে দেখল—বাবা।

'কোথায় যাচ্ছ গো মা?'

'এক জন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। তোমার কি চা লাগবে?'

'হলে ভালো হত। থাক, তুই ব্যস্ত।'

'চা বানাতে আর কয় মিনিট লাগবে! তুমি বস, আমি বানিয়ে আনছি।'

নীলুর বাবা চেয়ার টেনে নীলুর ঘরেই বসলেন।

'চা কি চিনি ছাড়া আনব বাবা?'

'না, এক চামচ চিনি দিস। একটু-আধটু চিনি খেলে কিছু হবে না।'

নীলু চা নিয়ে এসে দেখে বাবা ঝিমুচ্ছেন। ঝিমুনিরও বেশি, প্রায় ঘুমাচ্ছেন বলা চলে। বাবা যেন বড় বেশি দ্রুত বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন। বড় মায়া লাগল নীলুর।

'বাবা, তোমার চা।'

'কোন বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছিস মা?'

নীলু খানিক ইতস্তত করে বলল, 'তোমাকে আমি পরে বলব বাবা।'

'সন্ধ্যার আগেই আসবি তো?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

'গাড়ি নিয়ে যাবি?'

'না, গাড়ি নেব না।'

'নিয়ে যা না। ড্রাইভার তো দিনরাত বসে-বসেই মায়না খায়।'

'বাবা, আমি গাড়ি নেব না।'

নীলুর সাজ শেষ হলো ঠিক সাড়ে তিনটায়। আয়নায় তাকিয়ে নিজেকে তার পছন্দই হলো। যে মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে, সে বেশ রূপসী। তার মায়া-কাড়া দুটি চমৎকার চোখ আছে। কিশোরীদের মতো ছোট একটি চিবুক। ভালোই তো! এ রকম একটি মেয়েকে পুরুষরা কি ভালোবাসে না? নাকের কাছে মুক্তোর মতো কিছু ঘামের বিন্দু। নীলু তার সবুজ রুমাল দিয়ে সাবধানে ঘাম মুছে ফেলল। তারপর উঠে এল তিনতলায়।

'রানু, রানু।'

রানু যেন তৈরি হয়েইছিল। সে বেরিয়ে এল সঙ্গে-সঙ্গে।

'তুমি যাবে বলেছিলে আমার সঙ্গে। চল।'

'চল।'

রানু তালা লাগাল। নীলু মৃদু স্বরে বলল, 'তুমি জানতে আমি আসব?'

'হ্যাঁ, জানতাম।'

সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করল। কারো দেখা পাওয়া গেল না। এক সময় নীলু বলল, 'এখন চলে যেতে চাও রানু?'

'আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। তোমার তো এখনো যেতে ইচ্ছা করছে না।'

'এক জায়গায় দাঁড়িয়ে না থেকে চল হাঁটি।'

তারা বেশ কয়েক বার নিউ মার্কেট চক্কর দিয়ে ফেলল। কেউ এগিয়ে এসে বলল না, 'তোমাদের মধ্যে নীলু কে?'

'রানু, তোমার কি হাঁটতে টায়ার্ড লাগছে?'

'না।'

'রানু, তুমি তো অনেক কিছু বুঝতে পার, তাই না?'

'মাঝে-মাঝে পারি।'

'লোকটি এসেছে কি না বুঝতে পারছ না?'

'না নীলু, পারছি না। আমি সব সময় পারি না।'

রানু লক্ষ্য করল, নীলুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সে তার সবুজ রুমাল দিয়ে চোখ চেপে ধরল। রানু গাঢ় স্বরে বলল, 'কাঁদে না নীলু।'

'কান্না এলে কী করব?'

'মনটা শক্ত কর ভাই। পৃথিবীটা খুব ভালো জায়গা নয়।'

লোকজন তাকাচ্ছে ওদের দিকে। রানু নীলুর হাত ধরে বাইরে নিয়ে এল। বেশ অস্বস্তিকর অবস্থা।

তার প্রায় চার দিন পর নীলু একটি চিঠি পেল।

প্রিয় নীলু,

ঐদিন তোমাকে দেখলাম। তুমি তো ভারি মিথ্যুক! কেন বললে তুমি দেখতে সুন্দর নও? তোমাকে বর্ষার জলভারে নত আকাশের মতো লাগছিল। আমি ছুটে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমার বান্ধবীকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছি। কথা ছিল একা আসবে। তাই নয় কি?

শুধু আমরা দুই জন থাকব। আমাকে দেখে যদি তোমার কথা বলতে ইচ্ছে করে, তাহলে কোনো একটি রেস্টুরেন্টে বসে দুই জনে চা খেতে-খেতে গল্প করব।

আর যদি তোমার আমাকে পছন্দ না-হয়, তাহলে তুমি তোমার সবুজ রুমালটি তোমার হ্যান্ডব্যাগে লুকিয়ে ফেলবে।

তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। আমি মন-খারাপ করব ঠিকই, কিন্তু বিদায় নেব হাসিমুখে, এবং আর কোনো দিনই তুমি আমাকে দেখবে না। তবে নীলু, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, আমাকে তুমি অপছন্দ করবে না। এ রকম মনে করার কোনোই কারণ নেই, তবু মনে হচ্ছে। খুব সম্ভব উইশফুল থিংকিং। না মেয়ে?

নীলু চিঠিটি সমস্ত দিনে প্রায় একশ' বার পড়ল এবং প্রতি বারই তার কাছে নতুন মনে হলো। রাতে সে অদ্ভুত সুন্দর একটি স্বপ্ন দেখল—যেন পুরোনো আমলের একটি পালতোলা জাহাজে সে বসে আছে। জাহাজের পালটি গাঢ় সবুজ রঙের। প্রচণ্ড বাতাস দিচ্ছে। বাতাসে জাহাজ ছুটে চলেছে বিদ্যুৎগতিতে। নীলুর একটু ভয়ভয় লাগছে, কারণ জাহাজে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। নীলু এক সময় বলল, 'আমার ভয় লাগছে এই জাহাজে। আর কেউ কি আছে?' সঙ্গে-সঙ্গে একটি ভারি পুরুষালি গলা শোনা গেল, 'ভয় নেই নীলু। আমি আছি।' স্বপ্ন এত সুন্দর হয়!

নীলুর ঘুম ভেঙে গেল। বাকি রাত সে আর ঘুমোতে পারল না। বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বিলু জেগে উঠে বলল, 'কী হয়েছে রে আপা?'

নীলু ভেজা গলায় বলল, 'পেট ব্যথা করছে। এখন একটু কম। তুই ঘুমো।'

১০

অনুফার কাছ থেকে নতুন কিছু জানা গেল না। সেও খুব জোর দিয়ে বলল, রানুর পরনে পায়জামা ছিল এবং মৃত লোকটির পরনেও কাপড় ছিল।

'আপনি লোকটিকে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি করে বলছেন কেন? মুরুব্বি মানুষ আপনি। আমি আপনার মেয়ের বয়েসী।'

'লোকটিকে কেমন দেখলে বল তো!'

'চাচা, আমার কিছু মনে নেই। সেই সময় আমি ঘোরের মধ্যে ছিলাম। পরদিন আমার বিয়ে।'

'হ্যাঁ, তা আমি জানি। লোকটিকে নদীর পারে পুঁতে রাখা হয়, তাই না?'

'জ্বি। তারপর অনেক দিন কেউ ওদিকে যেত না। সবাই বলাবলি করত,

রাতে কী জানি দেখতে পায়।'

'কী দেখতে পায়?'

'ছায়া-ছায়া কী নাকি দেখে। তবে এইসব সত্যি না চাচা। সব মনগড়া।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি। ভূতপ্রেত বলে কিছু নেই।'

মিসির আলি বড়ই অবাক হলেন। গ্রামের কোনো মেয়ে এইভাবে চিন্তা করে না। এতটা মুক্তচিন্তা তাদের থাকার কথা নয়। মিসির আলি বললেন, 'তুমি পড়াশোনা কত দূর করেছ?'

'চাচা, আমি আই.এ. পড়ার সময় আমার বিয়ে হয়। তারপর আর পড়াশোনা হয় নি। গ্রামে বিয়ে হয়েছে তো! পড়াশোনা করার আমার খুব শখ ছিল।'

'মানুষের সব শখ মেটা উচিত নয়। একটা কোনো ডিসস্যাটিসফেকশন থাকা দরকার।'

'কেন?'

'তাহলে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে। সব শখ মিটে গেলে বেঁচে থাকার প্রেরণা নষ্ট হয়ে যায়। যে সব মানুষের শখ মিটে গেছে, তারা খুব অসুখী মানুষ।'

অনুফা চুপ করে রইল। মিসির আলি মৃদু স্বরে বললেন, 'এবার রানুর কথা বল।'

'কী কথা জানতে চান?'

'সব কথা।'

'ও খুব অদ্ভুত মেয়ে। ও মানুষের ভবিষ্যৎ বলতে পারে।'

'কীভাবে বলে?'

'তা জানি না, তবে বলতে পারে। একবার কী হয়েছে, শোনেন। আমি আর ও গল্প করছি, সে হঠাৎ গল্প থামিয়ে বলল—কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের বাড়িতে শ্রীপুরের খালারা বেড়াতে আসবেন। আর সত্যি-সত্যি তাঁরা এলেন।'

'এটা তো এমনিতেও হতে পারে। মানুষ বেড়াতে আসে না?'

'তা আসে। কিন্তু শ্রীপুরের খালা পাঁচ বছর পর প্রথম এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের কী-একটা ঝগড়া চলছিল।'

'ও, তাই নাকি?'

'জ্বি। আরেক গল্প বলি শোনেন, তখন আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে রানুদের ওখানে বেড়াতে গিয়েছি—না, এটা আপনাকে বলা যাবে না।'

'বলা যাবে না কেন?'

'গল্পটা ভালো না।'

'থাক, তাহলে অন্য গল্প বল।'

অনুফার স্বামীকেও মিসির আলি সাহেবের বেশ লাগল। গোঁয়ারগোবিন্দ ধরনের লোক। স্ত্রীর খুবই অনুগত। সে মিসির আলিকে নিয়ে প্রচুর ঘুরল। লোকটির যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তিও দেখা গেল। মধুপুর থানার ওসি সাহেব ওর কথাতেই পুরোনো ফাইলপত্র ঘেঁটে দেখালেন যে, একটি মরা লাশ পাওয়ার খবরে এফআইআর করা হয়েছিল। তখন ওসি ছিলেন ব্রজগোপাল হালদার, তাঁর নোটে লেখা—

একটি কলেরায় মৃত মানুষের লাশ (৩০/৩৫) মধুপুরের নিমশাসা গ্রামে পাওয়া যায়। লাশটির পচন ধরিয়া গিয়াছিল। প্রাথমিক পরীক্ষার পর আমি লাশটি পুঁতিয়া ফেলিবার নির্দেশ দেই। লাশটির কোনো পরিচয় জানা যায় নাই।

মিসির আলি বললেন, 'কলেরায় মৃত, এটা বোঝা গেল কী করে?'

ওসি সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'সেটা আমি কী করে বলব? রিপোর্ট তো আমার লেখা না। ব্রজগোপাল বাবুকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি জানবেন।'

'তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'পুলিশ ডাইরেক্টরেটে খোঁজ করেন। তবে এই সব খোঁজাখুঁজির কোনো অর্থ নেই। দশ বৎসর আগের ঘটনা মনে করে বসে আছেন নাকি? পুলিশকে আপনারা কী মনে করেন বলেন তো?'

'ঘটনাটা অস্বাভাবিক। সে জন্যই হয়তো তাঁর মনে থাকবে।'

'একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে পানিতে, এর মধ্যে আপনি অস্বাভাবিক কী দেখলেন? বাংলাদেশে প্রতি দিন কয়টা ডেড বডি পাওয়া যায় জানেন?'

'জ্বি-না, জানি না।'

'পুলিশের লাইনে ডেড বডি পাওয়াটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা, বুঝলেন?'

মিসির আলি মধুপুরে আরো এক দিন থাকলেন। দেখে এলেন, যে জায়গায় লোকটিকে পোঁতা হয়েছিল সেই জায়গা। দেখার মতো কিছু নয়। ঘন কাঁটাবন হয়েছে, যার মনে হচ্ছে এই জায়গাটিকে বেশ কিছু দিন লোকজন ভয়ের চোখে দেখেছেন। হাঁটাচলা বন্ধ করে দিয়েছে নিশ্চয়ই।

মিসির আলি অনেকের সঙ্গেই কথা বললেন—যদি নতুন কিছু পাওয়া যায়। নতুন কোনো তথ্য, যা কাজে লাগবে, কিন্তু কিছুই জানা গেল না। দশ বৎসর দীর্ঘ সময়। এই সময়ে মানুষ অনেক কিছু ভুলে যায়।

মধুপুর থেকে তিনি গেলেন রানুদের আদি বাড়িতে। সেখানে যাবার তাঁর একটি উদ্দেশ্য, খুঁজে দেখা—জালালউদ্দিন নামে কাউকে পাওয়া যায় কি না। এই লোকটিকে পাওয়া খুবই প্রয়োজন।

আনিস লক্ষ্য করল, রানু ইদানীং বেশ স্বাভাবিক। এর প্রধান কারণ বোধহয় বাড়িঅলার দুটি মেয়ে। ওদের সঙ্গে সে বেশ মিলেমিশে আছে। গল্পের বই আনছে। ভালোমন্দ কিছু রান্না হলেই আগ্রহ করে নিচে নিয়ে যাচ্ছে। বাড়িঅলাদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা আনিসের পছন্দ নয়। বাড়িঅলাদের সে সব সময় শত্রুপক্ষ বলেই মনে করে। কয়েক বার ভেবেছিল বলবে মেলামেশাটা কমাতে। না বলে ভালোই হয়েছে, এতে যদি অসুখটা চাপা পড়ে তো ভালোই।

কাজের একটি ছেলে পাওয়া গেছে—জিতু মিয়া। এই ছেলেটিও রানুকে বেশ ব্যস্ত রাখছে। ছেলেটির বয়স দশ-এগার, তবে মহাবোকা। কোনো কাজই করতে পারে না। করার আগ্রহও নেই। রানু ক্রমাগত বকাঝকা করেও কিছু করাতে পারে না। তবে তার সময় বেশ কেটে যায়।

সন্ধ্যাবেলা সে আবার জিতু মিয়াকে নিয়ে পড়াতে বসে। জিতু ঘুমঘুম চোখে পড়ে 'স্বরে অ স্বরে আ'। এই পড়াটি গত এক সপ্তাহ ধরে চলছে। জিতু মিয়া কিছুই মনে রাখতে পারছে না, কিন্তু তাতে রানুর উৎসাহে ভাটা পড়ছে না।

আনিস এক দিন ঠাট্টা করে বলেছে, 'তুমি দেখি একে বিদ্যাসাগর বানিয়ে ফেলছ!' রানু তাতে বেশ রাগ করেছে। গম্ভীর হয়ে বলেছে, 'ঠাট্টা করছ কেন? বিদ্যাসাগর তো এক দিন হতেও পারে।'

অবশ্য অদূর-ভবিষ্যতে তেমন কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। ভবিষ্যৎ-বিদ্যাসাগর রোজ রাতেই পড়তে-পড়তে ঘুমিয়ে পড়ছে এবং রানু প্লেটে খাবার বেড়ে প্রতি রাতেই প্রাণান্ত চেষ্টা চালাচ্ছে। এতটা বাড়াবাড়ি আনিসের ভালো লাগে না, কিন্তু সে কিছু বলে না। থাকুক একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত।

এর মধ্যে এক দিন আনিস গিয়েছিল মিসির আলি সাহেবের কাছে। ভদ্রলোক বেশ কিছু দিন ঢাকায় ছিলেন না। সবে ফিরেছেন। তাঁর চোখ হলুদ, গা হলুদ। আনিস অবাক হয়ে বলেছে, 'হয়েছে কী আপনার?'

'জন্ডিস। জন্ডিস বাধিয়ে বসেছি।'

'বলেন কী!'

'ইনফেকটাস হেপাটাইটিস। লিভারের অবস্থা কাহিল রে ভাই! আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?'

'ভালো।'

'আর ভয়টয় পাচ্ছেন না?'

'জ্বি-না।'

'খুব ভালো খবর। আমি একটু সুস্থ হলেই যাব আপনার বাসায়।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আমি কিছু খোঁজখবর পেয়েছি। মনে হয় আপনার স্ত্রীর সমস্যাটি ধরতে পেরেছি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, একটু ভালো হলেই এ নিয়ে কথা বলব।'

রানু মিসির আলি সাহেবের জন্ডিসের খবরে খুবই মন-খারাপ করল।

'আহা, বেচারা একা-একা কষ্ট করছে। চল এক দিন দেখে আসি। যাবে?'

'ঠিক আছে, যাব একদিন।'

'কবে যাবে? কাল যাবে?'

'এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? জন্ডিস যখন হয়েছে, তখন বেশ কিছু দিন থাকবে। এক দিন দেখে এলেই হবে।'

'আমি এই অসুখের ভালো অষুধ জানি। অড়হড়ের পাতার রস। সকালবেলা এক গ্লাস করে খেলে তিন দিনে অসুখ সেরে যাবে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আমার দাদা এই অষুধটা দিতেন। তুমি কিছু অড়হড়ের পাতা ঐ লোকটিকে দিয়ে এস না।'

'ঢাকা শহরে আমি অড়হড়ের পাতা কোথায় পাব? কী যে বল!'

'খুঁজলেই পাবে। জংলা গাছ সব জায়গায় হয়।'

আনিস যথেষ্ট বিরক্ত হলো। রানুর এই একটা প্রবলেম—কোনো-একটা জিনিস মাথায় ঢুকলে ওটা নিয়েই থাকবে। আনিস বলল, 'আচ্ছা, দেখি।'

'দেখাদেখি না, তুমি খুঁজবে। আর শোন, কাল তো তোমার অফিস নেই, চল ওনাকে দেখে আসি।'

'এত ব্যস্ত কেন? ভদ্রলোক তো আর পালিয়ে যাচ্ছেন না।'

রানু থেমে-থেমে বলল, 'আমি অন্য একটা কারণে যেতে চাই।'

'কি কারণ?'

'ভদ্রলোক আমার সম্পর্কে খোঁজখবর করার জন্যে মধুপুর গিয়েছিলেন, কী খোঁজ পেলেন জানতে ইচ্ছা করছে।'

'মধুপুরের খবর পেলে কীভাবে? স্বপ্নে?'

'না, স্বপ্নটপ্ন না। অনুফা চিঠি দিয়েছে।'

'কবে চিঠি পেয়েছ?'

'গতকাল।'

আনিস চুপ করে গেল। রানু তার নিজের চিঠিপত্রের কথা আনিসকে কখনো

বলে না। বিয়ের পর রানু তার আত্মীয়স্বজনের যত চিঠিপত্র পেয়েছে তার কোনোটি সে আনিসকে পড়তে দেয় নি। এ নিয়ে আনিসের গোপন ক্ষোভ আছে।

'কি, আমাকে নিয়ে যাবে?'

'আমি আগে গিয়ে দেখি ভদ্রলোকের অবস্থা কেমন।'

মিসির আলিকে পাওয়া গেল না। বাড়িতে তাঁর এক ছোট ভাই ছিল, সে বলল, 'ভাইয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অবস্থা বেশি ভালো না। বিলরুবিন নাইন পয়েন্ট ফাইভ। লিভার খুবই ড্যামেজ্‌ড্‌।

১১

মিসির আলি হাসপাতালে এসেছেন একগাদা বই নিয়ে। তাঁর ধারণা ছিল বই পড়ে সময়টা খুব খারাপ কাটবে না, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে রকম হয় নি। ডাক্তাররা বই পড়তে নিষেধ করেন নি, কিন্তু দেখা গেল বই পড়া যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই মাথার ভেতর ভোঁতা এক ধরনের যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণা নিয়ে বই পড়ার কোনো মানে হয় না। তবু তিনি মৃত্যু-বিষয়ক একটি বই পড়ে ফেললেন এবং মৃত্যু ব্যাপারটিতে যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করতে লাগলেন। তাঁর স্বভাবই হচ্ছে কোনো বিষয় একবার মনে ধরে গেলে সে বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত পড়াশোনা করতে চেষ্টা করেন।

মৃত্যু সাবজেক্টটি তাঁর পছন্দ হয়েছে, কিন্তু এ বিষয়ে পড়াশোনা করতে পারছেন না। বইপত্র নেই। ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে কিছু থাকার কথা, কিন্তু আনাবেন কাকে দিয়ে? তাঁকে কেউ দেখতে আসছে না। তিনি এমন কোনো জনপ্রিয় ব্যক্তি নন যে তাঁর অসুস্থতার খবরে মানুষের ঢল নামবে। তা ছাড়া অসুখের খবর তিনি কাউকে জানান নি। হাসপাতালে ভর্তি হবার ইচ্ছাও ছিল না, কিন্তু ঘরে দেখাশোনার লোক নেই। কাজের মেয়েটি তিনি মধুপুর থাকাকালীন বেশ কিছু জিনিসপত্র নিয়ে ভেগে গেছে। এমন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ছাড়া উপায় কী?

বিকালবেলা তাঁর কাছে কেউ আসে না। সবারই আত্মীয়স্বজন আসে দেখতে, তাঁর কাছে কেউ আসে না। এই সময়টা তিনি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকেন এবং এখনো মানুষের সঙ্গ পাবার জন্যে তাঁর মন কাঁদে দেখে নিজের কাছেই লজ্জিত বোধ করেন।

আজ সারা দিন মিসির আলির খুব খারাপ কেটেছে। তাঁর রুমমেট ছাব্বিশ বছরের ছেলেটি সকাল ন'টায় বিনা নোটিসে মারা গেছে। মৃত্যু যে এত দ্রুত

মানুষকে ছুঁয়ে দিতে পারে তা তাঁর ধারণাতেও ছিল না। ছেলেটা ভোরবেলায় নাশতা চেয়েছে, তার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্তাও বলেছে। তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, 'আজ কেমন আছ?'

'আজ বেশ ভালো।'

'লিভার ব্যথা করছে না?'

'নাহ্, তবে তলপেটের দিকে একটা চাপা ব্যথা আছে।'

'খুব বেশি?'

'না, খুব বেশি না। আপনি এটা কী বই পড়ছেন?'

'এটা একটা সায়েন্স ফিকশন—"ফ্রাইডে দি থার্টিন্থ"। বেশ ভালো বই। তুমি পড়বে?'

'জ্বি-না। ইংরেজি বই আমার ভালো লাগে না। বাংলা উপন্যাস পড়ি।'

'কার লেখা ভালো লাগে? এ দেশের-মানে বাংলায়, কার লেখা তোমার পছন্দ?'

'নিমাই ভট্টাচার্য।'

'তাই নাকি?'

ছেলেটি আর জবাব না দিয়ে কাৎরাতে থাকে। সকাল সাড়ে আটটায় বলল, 'এক জন ডাক্তার পাওয়া যায় কি না দেখবেন?' তিনি অনেকক্ষণ বোতাম টিপলেন, কেউ এল না। শেষ পর্যন্ত নিজেই গেলেন ডিউটি রুমে। ফিরে এসে দেখেন ছেলেটি মরে পড়ে আছে।

মৃত্যুর সময় পাশে কেউ থাকবে না, এর চেয়ে ভয়াবহ বোধহয় আর কিছু নেই। শেষ বিদায় নেবার সময় অন্তত কোনো-একজন মানুষকে বলে যাওয়া দরকার। নিঃসঙ্গ ঘর থেকে একা-একা চলে যাওয়া যায় না। যাওয়া উচিত নয়। এটা হৃদয়হীন ব্যাপার।

এত দিন যে ছেলেটি ছিল, এখন আর সে নেই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তার সমস্ত চিহ্ন এ ঘর থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বিছানায় নতুন বালিশ ও চাদর দিয়ে গেছে—হয়তো সন্ধ্যার মধ্যে কোনো নতুন পেশেন্ট এসে পড়বে।

মিসির আলি সমস্ত দিন কিছু খেতে পারলেন না। বিকেলের দিকে তাঁর গায়ে বেশ টেম্পারেচার হলো। প্রথম বারের মতো মনে হলো একজন-কেউ তাঁকে দেখতে এলে খারাপ লাগবে না। ভালোই লাগবে। কেউ না এলে এক জন রোগী হলেও আসুক, একা-একা এই কেবিনে রাত কাটানো যাবে না। ঠিক এই সময় ইতস্তত ভঙ্গিতে রানু এসে ঢুকল।

'আপনি ভালো আছেন?'

'না, ভালো না। তুমি কোত্থেকে?'

'বাসা থেকে। ইস্! আপনার এ কী অবস্থা!'

'অবস্থা খারাপ ঠিকই। আনিস সাহেব কোথায়?'

'ও আসে নি, আমি একাই এলাম। ওর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়েছি।'

'বস তুমি। ঐ চেয়ারটায় বস। ফ্লাস্কে চা আছে। খেতে চাইলে খেতে পার।'

'উঁহু, চা-টা খাব না। আপনার কাছে একটা খবর জানতে এসেছি।'

'কোন খবরটি?'

'মধুপুরে গিয়ে আপনি কী জানলেন?'

'তেমন কিছু জানতে পারি নি।'

'তবু যা জেনেছেন তা-ই বলুন। আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে। অনুফা লিখেছে, আপনি নাকি হাজার-হাজার মানুষকে নানা রকম প্রশ্ন করেছেন।'

মিসির আলি হাসলেন।

'হাসলে হবে না, আমাকে বলতে হবে।'

'প্রথম যে জিনিসটি জানলাম—সেটি হচ্ছে, তুমি অনেকগুলো ভুল তথ্য দিয়েছ।'

'আমি কোনো তথ্য দিই নি।'

'তুমি নিজে হয়তো জান না সেগুলো ভুল। যেমন পায়জামা খোলার ব্যাপারটি—এ রকম কোনো কিছু ঘটে নি।

রানু চোখ লাল করে বলল, 'ঘটেছে।'

'না রানু, ঘটে নি। এটা তোমার কল্পনা। তা ছাড়া তুমি উলঙ্গ একটি ডেড বডির কথা বলেছ—সেটাও ঠিক না।'

'কিন্তু আমি জানি, এগুলো ঠিক।'

'না রানু। এইসব তুমি নিজে ভেবেছ এবং আমার ধারণা এ জাতীয় স্বপ্ন তুমি মাঝে-মাঝে দেখ। দেখ না?'

'কী রকম স্বপ্নের কথা বলছেন?'

মিসির আলি কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন। স্পষ্ট গলায় বললেন, 'তুমি প্রায়ই স্বপ্ন দেখ না—এক জন নগ্ন মানুষ তোমার কাপড় খোলার চেষ্টা করছে?'

রানু উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে থাকল।

'বল রানু। জবাব দাও।'

'হ্যাঁ, দেখি।'

'কখনো কি ভেবে দেখেছ এ রকম স্বপ্ন কেন দেখ?'

'না, ভাবি নি।'

'আমি ভেবেছি এবং কারণটাও খুঁজে বের করেছি। আজ সেটা বলতে চাই না, অন্য এক দিন বলব।'

'না, আপনি আমাকে আজই বলেন।'

'মিসির আলি ফ্লাস্ক থেকে চা ঢাললেন। শান্ত স্বরে বললেন, 'চা খেতে-খেতে শোন। চায়ে ক্যাফিন আছে। ক্যাফিন তোমার নার্ভগুলোকে অ্যাকটিভ রাখবে।'

রানু চায়ের পেয়ালা নিল, কিন্তু চুমুক দিল না। মাথা নিচু করে বসে রইল। মিসির আলি ঠাণ্ডা গলায় বলতে লাগলেন, 'রানু, তোমাকে নিয়ে এই গল্পটি আমি তৈরি করেছি। তুমি মন দিয়ে শোন। তুমি যখন বেশ ছোট—নয়, দশ বা এগার বছর বয়স, তখন এক জন বয়স্ক লোক তোমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নির্জন কোনো জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। তোমাদের গ্রামে এ রকম একটা নির্জন জায়গার খোঁজে আমি গিয়েছিলাম। সেখানে জঙ্গলের কাছে একটা ভাঙা বিষ্ণুমন্দির দেখেছি। মনে হয় ঐ জায়গাটাই হবে। কারণ সাপের ভয়ে ওখানে কেউ যেত না। রানু, তুমি কি আমার কথা শুনছ?'

'শুনছি।'

'তারপর সেই বয়স্ক মানুষটি মন্দিরে তোমাকে নিয়ে গেল।'

'আমাকে কেউ নিয়ে যায় নি। আমি নিজেই গিয়েছিলাম। ঐ মন্দিরে খুব সুন্দর একটি দেবীমূর্তি আছে। আমি ঐ মূর্তি দেখার জন্যে যেতাম।'

'তারপর কী হয়েছে, বল।'

রানু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তীব্র স্বরে বলল, 'আমি বলব না, আপনি বলুন।'

মিসির আলি শান্ত স্বরে বললেন, 'ঐ লোকটি তখন টেনে তোমার পায়জামা খুলে ফেলল।'

রানুর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

'ঐ লোকটির নাম ছিল জালালউদ্দিন।'

রানু কিছু বলল না। মিসির আলি বললেন, 'তোমার অসুখ শুরু হলো সেদিন থেকে। তোমার মনের মধ্যে ব্যাপারটি গেঁথে গেল, পরবর্তী সময়ে গোসলের সময় যখন মরা মানুষটি তোমার পায়ে লেগে গেল, তখন তোমার মনে পড়ল মন্দিরের দৃশ্য। বুঝতে পারছ?'

রানু জবাব দিল না।

'অসুখের মূল কারণটি আলোয় নিয়ে এলেই অসুখ সেরে যায়; এ জন্যেই আমি এটা তোমাকে বললাম। তুমি নিজেও এখন গোড়া থেকে সমস্ত ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা করবে। তোমার অসুখ সেরে যাবে।'

রানু মৃদু স্বরে বলল, 'আপনি কি ঐ লোকটির সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'বলেছি।'

'ও কী বলেছে?'

'তেমন কিছু বলে নি।'

'না, বলেছে, আপনি আমাকে বলতে চাচ্ছেন না। এতটা যখন বলেছেন, তখন বাকিটাও বলুন।'

রানু তীব্র চোখে তাকাল। মিসির আলি বললেন, 'দেখ রানু, আমি খুবই যুক্তিবাদী মানুষ। অলৌকিক কোনো কিছুতে বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি সব কিছুরই একটি ব্যাখ্যা আছে। জালালউদ্দিন যা বলেছে, তাও নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করা যায়।'

'ব্যাখ্যা পরে করবেন। আগে বলুন, সে কী বলেছে?'

'সে বলেছে, হঠাৎ সে দেখে মূর্তিটি ছুটে এসে তোমার মধ্যে মিলিয়ে গেছে। তোমার গা থেকে আগুনের হল্‌কা বেরুচ্ছে। জালালউদ্দিন তখন ছুটে পালিয়ে যায়।'

'আপনি জালালউদ্দিনের কথা বিশ্বাস করেন না?'

'না। ওর মনে পাপবোধ ছিল। মন্দিরটন্দির নিয়ে মূর্খ মানুষদের মনে অনেক রকম ভয়-ভীতি আছে। তা থেকেই সে একটা হেলুসিনেশন দেখেছে। তুমি নিজে তো কিছু দেখ নি।'

'না।'

'তাহলেই হলো। জালালউদ্দিন কী দেখেছে না-দেখেছে, সেটা তার প্রবলেম, তোমার নয়।'

রানু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু একটা জিনিস কি জানেন? ঐ ঘটনার পর থেকে আমি অসম্ভব সুন্দর হয়ে গেলাম।'

মিসির আলি শব্দ করে হাসলেন। হাসতে-হাসতে বললেন, 'সুন্দর তুমি সব সময়ই ছিলে। ঘটনাটি ঘটেছে তোমার বয়ঃসন্ধিতে। বয়ঃসন্ধির পর মেয়েদের রূপ খুলতে শুরু করে। এখানেও তাই হয়েছে।'

'কিন্তু ঐ দেবীমূর্তিটিকে এর পর আর খুঁজে পাওয়া যায় নি।'

'তুমি কিন্তু খুব ছেলেমানুষের মতো কথা বলছ রানু। মূর্তিটি চুরি গেছে, কেউ নিয়ে পালিয়ে গেছে, ব্যস।'

'মূর্তিটি চুরি যায় নি।'

'তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর না—একটা পাথরের মূর্তি তোমার মধ্যে ঢুকে আছে? কি, কর?'

রানু তীব্র কণ্ঠে বলল, 'আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলুন, আমাকে কি অনেকটা মূর্তির মতো দেখায় না?'

'না রানু, মূর্তির মতো দেখাবে কেন? অসম্ভব রূপবতী একটি তরুণী—এর বেশি কিছু না। তোমার মতো রূপবতী মেয়ে এ দেশেই আছে এবং তারা সবাই রক্ত-মাংসের মানুষ।'

রানু উঠে দাঁড়াল। মিসির আলি বললেন, 'চলে যাচ্ছ রানু?'

'হ্যাঁ।'

'অসুখ সারলে তোমাদের ওখানে একবার যাব।'

'না, আপনি আসবেন না। আপনার আসার কোনো দরকার নেই।'

রানু ঘর ছেড়ে চলে গেল। মিসির আলি ক্ষীণস্বরে বললেন, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং।' তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। তিনি ব্যাপারটি ঠিক বুঝতে পারছেন না। যতটা সহজ মনে হয়েছিল এখন ততটা মনে হচ্ছে না। তিনি মৃত্যু-বিষয়ক বইটি আবার পড়তে শুরু করলেন। সাবজেক্টটি তাঁকে বেশ আকর্ষণ করেছে। ফ্যাসিনেটিং টপিক।

১২

গভীর রাতে আনিস জেগে উঠল। শুনশান নীরবতা চারদিকে। রানু হাত-পা ছড়িয়ে বাচ্চা মেয়ের মতো ঘুমোচ্ছে। জানালার আলো এসে পড়েছে তার মুখে। অদ্ভুত সুন্দর একটি মুখ। শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। আনিস ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল। বাথরুমে যেতে হবে।

বাথরুমে পানি জমে আছে। পাইপ জ্যাম হয়ে গেছে। বাড়িঅলাকে বলতে হবে। আনিস নোংরা পানি বাঁচিয়ে সাবধানে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেই শুনল ঝুমঝুম করে শব্দ হচ্ছে। নূপুর বাজছে যেন। এর মানে কী? মনের ভুল কি? মনের ভুল হবার কথা নয়। বেশ বোঝা যাচ্ছে নূপুর পায়ে দিয়ে ঝমঝম করতে-করতে কেউ-একজন এঘর-ওঘর করছে। শব্দটা অনেকক্ষণ ধরেই হচ্ছে। মনের ভুল হবার কথা নয়।

বাথরুমের দরজা খুলতেই শব্দটা চট করে থেমে গেল। শুধু একটা তীব্র ফুলের গন্ধ আনিসকে অভিভূত করে ফেলল। একটু আগেও তো এ রকম সৌরভ ছিল না। আনিসের মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। বিস্ময়ের ঘোর অবশ্যি বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। আনিসের মনে পড়ল একতলার বাগানে হাস্নাহেনার প্রকাণ্ড একটা ঝাড় আছে। বাতাসের ঝাপটায় ফুলের গন্ধই উড়ে এসেছে বারান্দায়। আনিস কিছুক্ষণ একা-একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল—নূপুরের শব্দ আবার যদি পাওয়া যায়।

দোতলার একটা বাচ্চা ছেলে শুধু কাঁদছে। তার মা তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে। একটা রিকশা গেল টুনটুন করে। ব্যস, আর কিছু শোনা গেল না।

শোবার ঘরে রানু ঘুমোচ্ছে। মড়ার মতো। জানালা খোলা। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে ঘরে। আনিস জানালা বন্ধ করতে গিয়ে শুনল, রান্নাঘর থেকে জিতু মিয়া সাড়াশব্দ দিচ্ছে। কান্না চাপার আওয়াজ।

'জিতু মিয়া।'

জিতু ফুঁপিয়ে উঠল। আনিস রান্নাঘরে ঢুকে বাতি জ্বালাল। জিতু মশারির ভেতর জবুথবু হয়ে বসে আছে।

'জিতু, কি হয়েছে রে?'

'কিছু হয় নাই।'

'বসে আছিস কেন?'

'ঘুম আহে না।'

'স্বপ্ন দেখেছিস?'

জিতু মাথা নাড়ল।

'কী স্বপ্ন?'

'এক জন মাইয়া মানুষ পাকের ঘরে হাঁটতে আছিল।'

'এই দেখেছিস স্বপ্নে?'

'স্বপ্নে দেখি নাই। নিজের চোখে দেখলাম।'

'দূর ব্যাটা, অন্ধকারে তুই মানুষ দেখলি কীভাবে? যা, ঘুমো।'

জিতু শুয়ে পড়ল। আনিস বলল, 'ভয়ের কিছু নেই, আমি জেগে আছি, ঘুমো তুই।'

'আচ্ছা।'

'আর শোন, রান্নাঘরে বাতি জ্বালানো থাকুক।'

'আচ্ছা।'

জিতু শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এল। আনিস একটি সিগারেট ধরাল। ঘুম চটে গেছে। তাকে এখন দীর্ঘ সময় জেগে থাকতে হবে। এক পেয়ালা চা খেতে পারলে মন্দ হত না। রাত তো বাজে প্রায় সাড়ে তিনটা। বাকি রাতটা তার জেগেই কাটবে মনে হয়। সিগারেট টানতে ভালো লাগছে না। পেটের ভেতর পাক দিয়ে উঠছে।

ঘুমের মধ্যে রানু শব্দ করে হাসল। আনিস মৃদু স্বরে ডাকল, 'এই রানু।' রানু খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, 'কি?'

'জেগে আছ নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কী আশ্চর্য, কখন জাগলে?'

'অনেকক্ষণ। তুমি বাথরুমে গেলে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকলে।'

'আমাকে ডাকলে না কেন?'

'শুধু-শুধু ডাকব কেন?'

আনিস সিগারেট টানতে লাগল। রানু বলল, 'বড্ড গরম লাগছে। জানালা বন্ধ করলে কেন?'

'গরম কোথায়? বেশ ঠাণ্ডা তো!'

'আমার গরম লাগছে। ফ্যানটা ছাড় না।'

'এই ঠাণ্ডার মধ্যে ফ্যান ছাড়ব কি, কী যে বল!'

রানু ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'তুমি যখন বাথরুমে ছিলে তখন কি নূপুরের শব্দ শুনেছ?'

আনিস ঠাণ্ডা স্বরে বলল, 'না তো, কেন?'

'না, এমনি। আমি শুয়ে-শুয়ে শুনছিলাম।'

'ঘুমাও রানু।'

'আমার ঘুম আসছে না।'

'ঘুম না এলে উঠে বস, গল্প করি। চা খাওয়া যেতে পারে, কি বল?'

রানু উঠে বসল, কিন্তু জবাব দিল না। আনিস দেখল রানু কোন ফাঁকে গায়ের কাপড় খুলে ফেলেছে। ক্লান্ত স্বরে বলল, 'বড্ড গরম লাগছে। তুমি আমার দিকে তাকিও না, প্লীজ!'

'এইসব কী রানু? ঘরে একটা বাচ্চা ছেলে আছে।'

'কী করব, বড্ড গরম লাগছে। তুমি বরং রান্নাঘরের বাতি নিভিয়ে সব অন্ধকার করে দাও।'

'না, বাতি জ্বালানো থাক।'

আনিস দ্বিতীয় সিগারেট ধরাল। রানু বলল, 'আমাদের গ্রামে একটা মন্দির আছে, তার গল্প এখন শুনবে না?'

'আহ্, মন্দির-ফন্দিরের গল্প এখন শুনব না।'

'আহ্, শোন না! আমার বলতে ইচ্ছে করছে। আমি যখন খুব ছোট, তখন একা-একা যেতাম সেখানে।'

'কি মন্দির? কালীমন্দির?'

'নাহ্, বিষ্ণুমন্দির বলত ওরা। তবে কোনো বিষ্ণুমূর্তি ছিল না। একটি দেবী ছিল। হিন্দুরা বলত রুকমিনী দেবী।'

'তুমি মন্দিরে যেতে কী জন্যে?'

'এমনি যেতাম। ছোট বাচ্চা পুতুল খেলে না?'

'কী করতে সেখানে?'

'দেবীমূর্তির সাথে গল্পগুজব করতাম। ছেলেমানুষি খেলা আর কি!'

বলতে-বলতে রানু খিলখিল করে হেসে উঠল। আনিস স্পষ্ট শুনল সঙ্গে-সঙ্গে ঝমঝম করে কোথাও নূপুর বাজছে। রানু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'শুনতে পাচ্ছ?'

'কী শুনব?'

'নূপুরের শব্দ শুনছ না?'

আনিস দৃঢ় স্বরে বলল, 'না। তুমি ঘুমাও রানু।'

'আমার ঘুম আসছে না।'

'শুয়ে থাক। তুমি অসুস্থ।'

রানু ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, আমি অসুস্থ।'

'তোমাকে খুব বড় ডাক্তার দেখাব আমি।'

'আচ্ছা।'

'এখন শুয়ে থাক।'

রানু মৃদু স্বরে বলল, 'আমি ঐ দেবীকে গান গেয়ে শোনাতাম।'

'ঐ সব অন্য দিন শুনব।'

'আজ রাতে আমার বলতে ইচ্ছে করছে।'

আনিস এসে রানুর হাত ধরল। গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। আনিস অবাক হয়ে বলল, 'তোমার গা তো পুড়ে যাচ্ছে!'

'হুঁ, বড্ড গরম লাগছে। ফ্যানটা ছাড়বে?'

আনিস উঠে গিয়ে জানালা খুলে দিল। ঘর ভর্তি হয়ে গেল ফুলের গন্ধে। আর তখনি রানু অত্যন্ত নিচু গলায় গুনগুন করে কী যেন গাইতে লাগল। অদ্ভুত অপার্থিব কোনো-একটা সুর—যা এ জগতের কিছু নয়। অন্য কোনো ভুবনের। রান্নাঘর থেকে জিতু ডাকতে লাগল, 'ও ভাইজান, ভাইজান।'

আনিস রানুকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে গায়ের চাদর টেনে দিল। জিতুকে বলল, এ ঘরে যেন না আসে। তারপর নেমে গেল নিচে, বাড়িঅলার মেয়েটিকে খবর দিয়ে নিয়ে আসতে।

নীলু এল সঙ্গে সঙ্গে। আনিস দেখল রানু শিশুর মতো ঘুমাচ্ছে। জিতু মিয়া শুধু জেগে আছে। কাঁদছে ব্যাকুল হয়ে। নীলুর সঙ্গে তার বাবাও আসছেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'হয়েছেটা কি?' আনিস ভাঙা গলায় বলল, 'বুঝতে পারছি না, কেমন যেন করছে।'

'কী করছে?'

আনিস জবাব দিল না। নীলু বলল, 'বাবা, তুমি শুয়ে থাক গিয়ে, আমি এখানে থাকি। রাত তো বেশি নেই।' ভদ্রলোক কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিচে নেমে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, 'হাসপাতালে নিতে হলে বলবেন, ড্রাইভারকে ডেকে তুলব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

রানু বাকি রাতটা ঘুমিয়ে কাটাল। একবারও জাগল না। নীলু সারাক্ষণ তার পাশে রইল। আনিসের সঙ্গে তার কথাবার্তা কিছু হলো না। আনিস বসার ঘরের সোফায় বসে ঝিমুতে লাগল।

১৩

মিসির আলি লোকটির ধৈর্য প্রায় সীমাহীন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই তিনি দ্বিতীয় দফায় রানুদের গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এক ভদ্রলোক, জয়নাল সাহেব। উদ্দেশ্য রুকমিনী দেবীর মন্দির সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

জয়নাল সাহেব মন্দির দেখে বিশেষ উল্লসিত হলেন না। তিন শ' বৎসরের বেশি এর বয়স হবে না। এ রকম ভগ্নস্তূপ এ দেশে অসংখ্য আছে। মিসির আলি বললেন, 'তেমন পুরোনো নয় বলছেন?'

'না রে ভাই। ইটের সাইজ দেখলেই বুঝবেন। ভেঙে টেঙে কী অবস্থা হয়েছে দেখেন!'

'যত্ন হয় নি। মন্দির যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি হয়তো মারা গেছেন কিংবা তাঁর উৎসাহ মিইয়ে গেছে।'

গ্রামের লোকজনের কাছ থেকে অল্প কিছু তথ্য পাওয়া গেল—পালবাবুদের প্রতিষ্ঠিত মন্দির। পালরা স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তার পরপরই তাদের ভাগ্য-বিপর্যয় শুরু হয়। তিন-চার বছরের মধ্যে পালরা নির্বংশ হয়ে পড়ে। দেবীকে তুষ্ট করার জন্যে তখন এক রাতে কুমারী বলির আয়োজন করা হয়। বার বছরের একটা কুমারীকন্যাকে অমাবস্যার রাত্রিতে মন্দিরের সামনে বলি দেয়া হয়। দেবীর তুষ্টি হয় না তাতেও। পাথরের মূর্তি এত সহজে বোধহয় তুষ্ট হয় না। তবে গ্রামের মানুষেরা নাকি বলি দেয়া মেয়েটিকে এর পর থেকে গ্রামময় ছুটোছুটি করতে দেখে। ময়মনসিংহ থেকে ইংরেজ পুলিশ সুপার এসে মন্দির তালাবন্ধ করে পালদের দুই ভাইকে গ্রেফতার করে নিয়ে যান।

পালরা অত্যন্ত ক্ষমতাবান ছিল। কাজেই ছাড়া পেয়ে এক সময় আবার গ্রামে

ফিরে আসে, কিন্তু মন্দির তালাবন্ধই পড়ে থাকে।

ইতিহাস এইটুকুই। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মূর্তি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা গেল না। দুই-এক ঘর নিম্নবর্ণের হিন্দু যারা ছিল, তারা বিশেষ কিছু বলতে পারে না। হরিশ মণ্ডল বলল, 'বাবু, আমরা কেউ ঐ দিকে যাই না। ঐ মন্দিরে গেলে নির্বংশ হতে হয়, কে যাবে বলেন?'

'আপনি তো শিক্ষিত লোক, এইসব বিশ্বাস করেন?'

'করি না, কিন্তু যাইও না।'

'মূর্তিটা আপনি দেখেছেন?'

'আমি দেখি নাই, তবে আমার জ্যাঠা দেখেছে।'

'তিনি কি নির্বংশ হয়েছেন?'

'না, তাঁর তিন ছেলে। এক ছেলে নান্দিনা হাইস্কুলের হেড মাস্টার।'

'মূর্তিটা কেমন ছিল বলতে পারেন?'

'শ্বেতপাথরের মূর্তি। কৃষ্ণনগরের কারিগরের তৈরি। একটা হাত ভাঙা ছিল।'

'মূর্তি নাকি হঠাৎ উধাও হয়েছে?'

'কেউ চুরিটুরি করে নিয়ে বিক্রি করে ফেলেছে। গ্রামে চোরের তো অভাব নাই। এ রকম একটা মূর্তিতে হাজারখানিক টাকা হেসেখেলে আসবে। সাহেবরা নগদ দাম দিয়ে কিনবে।'

'আচ্ছা, একটা বাচ্চা মেয়েকে যে বলি দেয়া হয়েছিল, সে নাকি অমাবস্যার রাত্রে ঘুরে বেড়ায়?'

'বলে তো সবাই। চিৎকার করে কাঁদে। আমি শুনি নাই। অনেকে শুনেছে।'

অমাবস্যার জন্যে মিসির আলিকে তিন দিন অপেক্ষা করতে হলো। তিনি অমাবস্যার রাত্রে একটা পাঁচ-ব্যাটারির টর্চ আর একটা মোটা বাঁশের লাঠি নিয়ে মন্দিরের চাতালে বসে রইলেন। তিনি কিছুই শুনলেন না। শেয়ালের ডাক শোনা গেল অবশ্যি। শেষ রাত্রের দিকে প্রচণ্ড বাতাস বইতে লাগল। বাতাসে শিষ দেবার মতো শব্দ হলো। সে সব নিতান্তই লৌকিক শব্দ। অন্য জগতের কিছু নয়। রাত শেষ হবার আগে-আগে বর্ষণ শুরু হলো। ছাতা নিয়ে যান নি। মন্দিরের ছাদ ভাঙা। আশ্রয় নেবার জায়গা নেই। মিসির আলি কাকভেজা হয়ে গেলেন।

ঢাকায় ফিরলেন প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে। ডাক্তার পরীক্ষা করে শুকনো মুখে বললেন, 'মনে হচ্ছে নিউমোনিয়া। একটা লাংস এফেকটেড, ভোগাবে।'

মিসির আলিকে সত্যি-সত্যি ভোগাল। তিনি দীর্ঘ দিন শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন।

১৪

বইপাড়াতে এ সময় লোকজন তেমন থাকে না। আজ যেন আরো নির্জন। নীলু একা-একা কিছুক্ষণ হাঁটল। তার খুব ঘাম হচ্ছে। বারবার সবুজ রুমালটি বের করতে হচ্ছে। চারটা দশ বাজে। চিঠিতে লিখেছে সে চারটার মধ্যেই আসবে, কিন্তু আশেপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। নীলু অবশ্যি কারো মুখের দিকে তাকাতেও পারছে না। কাউকে তাকাতে দেখলেই বুকের মধ্যে ধক করে উঠছে।

নীলু একটা বইয়ের দোকানে ঢুকে পড়ল। গল্পের বই তার তেমন ভালো লাগে না। ভালো লাগে বিলুর। বিলুর জন্যে একটা কিছু কিনলে হয়, কিন্তু কী কিনবে? সবই হয়তো ওর পড়া। ঐ দিন শীর্ষেন্দুর কী-একটা বইয়ের কথা বলছিল। নামটা মনে নেই।

'আচ্ছা, আপনাদের কাছে শীর্ষেন্দুর কোনো বই আছে?'

'জ্বি-না। আমরা বিদেশি বই রাখি না।'

নীলু অন্য একটা ঘরে ঢুকল। শুধু-শুধু দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। সে একটা কবিতার বই কিনে ফেলল। অপরিচিত কবি, তবে প্রচ্ছদটি সুন্দর। একটি মেয়ের ছবি। সুন্দর ছবি। নামটি সুন্দর—'প্রেম নেই'। কেমন অদ্ভুত নাম। 'প্রেম নেই' আবার কী? প্রেম থাকবে না কেন?

দাড়িঅলা এক জন রোগা ভদ্রলোক তখন থেকেই তার দিকে তাকাচ্ছে। লোকটির কাঁধে একটি ব্যাগ। এই কি সে! নীলুর মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। নীলু বইয়ের দাম দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল। তার পেছনে ফেরারও সাহস নেই। পেছনে ফিরলেই সে হয়তো দেখবে বুড়ো দাড়িঅলা গুটিগুটি আসছে।

না, লোকটি আসছে না। নীলুর মনে হলো, ভয়ানক মোটা এবং বেঁটে একজন কে যেন তাকে অনুসরণ করছে। তার দিকে তাকাচ্ছে না, কিন্তু আসছে তার পিছু পিছু। নীলুর তৃষ্ণা পেয়ে গেল। বড্ড টেনশান। বাড়ি ফিরে গেলে কেমন হয়? কিন্তু বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। নীলু ঘড়ি দেখল, পাঁচটা পাঁচ। তার মানে কি যে সে আসবে না? কথা ছিল নীলু থাকবে ঠিক এক ঘন্টা।

সে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। ভালোই হয়েছে। দেখা না-হওয়াটাই বোধহয় ভালো। দেখা হবার মধ্যে একটা আশাভঙ্গের ব্যাপার আছে। না-দেখার রহস্যময়তাটাই না হয় থাকুক। নীলু ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল।

'নীলু।'

নীলু দাঁড়িয়ে পড়ল।

'একটু দেরি হয়ে গেল। তুমি ভালো আছ নীলু?'

চকচকে লাল টাই-পরা যে ছেলেটি হাসছে, সে কে? লম্বা স্বাস্থ্যবান একটি

তরুণ। ঝলমল করছে। তার লাল টাই উড়ছে। বাতাসে মিষ্টি ঘ্রাণ আসছে। সেন্টের গন্ধ। পুরুষ মানুষের গা থেকে আসা সেন্টের গন্ধ নীলুর পছন্দ নয়, কিন্তু আজ এত ভালো লাগছে কেন?

'চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছ কেন? কিছু বল।'

'আপনি বলেছিলেন আপনি বুড়ো।'

'আমরা সবাই কিছু-কিছু মিথ্যা বলি। আমাকে নীলু নামের একটি মেয়ে লিখেছিল, সে দেখতে কুৎসিত।'

লোকটি হাসছে হা হা করে। এত সুন্দর করেও মানুষ হাসতে পারে! নীলুর এক ধরনের কষ্ট হতে লাগল। মনে হতে লাগল সমস্তটাই একটা সুন্দর স্বপ্ন, খুবই ক্ষণস্থায়ী। যেন এক্ষুণি স্বপ্ন ভেঙে যাবে। নীলু দেখবে সে জেগে উঠেছে, পাশের বিছানায় বিলু ঘুমাচ্ছে মশারি না-ফেলে, কিন্তু সে রকম কিছু হলো না। ছেলেটি হাসিমুখে বলল, 'কোথাও বসে এক কাপ চা খেলে কেমন হয়? খাবে?'

নীলু মাথা নাড়ল—সে খাবে।

'তুমি কিন্তু সবুজ রুমালটি ব্যাগে ভরে ফেলছ। আমি যেতে ঠিক সাহস পাচ্ছি না।'

নীলু অস্বাভাবিক ব্যস্ত হয়ে রুমাল বের করতে গেল। একটা লিপস্টিক, একটা ছোট চিরুনি, কিছু খুচরো পয়সা গড়িয়ে পড়ল নিচে। ছেলেটি হাসিমুখে সেগুলো কুড়োচ্ছে। নীলু মনে-মনে বলল—যেন এটা স্বপ্ন না হয়। আর স্বপ্ন হলেও যেন স্বপ্নটা অনেকক্ষণ থাকে। নীলুর খুব কান্না পেতে লাগল।

নিউ মার্কেটের ভেতর চা খাওয়ার তেমন ভালো জায়গা নেই। ওরা বলাকা বিল্‌ডিংয়ের দোতলায় গেল। চমৎকার জায়গা! অন্ধকার-অন্ধকার চারদিক। পরিচ্ছন্ন টেবিল। সুন্দর একটি মিউজিক হচ্ছে।

'চায়ের সঙ্গে কিছু খাবে নীলু?'

'নাহ্।'

'এরা ভালো সমুচা করে। সমুচা দিতে বলি? আমার খিদে পেয়েছে। কি, বলব?'

'বলুন।'

ছেলেটি হাসল। নীলুর খুব ইচ্ছা করছিল, জিজ্ঞেস করে—হাসছ কেন তুমি? আমি কি হাস্যকর কিছু করেছি? কিন্তু নীলু কিছু বলল না। ছেলেটি হাসতে-হাসতে বলল, 'আসলে আমি বিজ্ঞাপনটা মজা করবার জন্যে দিয়েছিলাম, কেউ জবাব দেবে ভাবি নি।'

'আমি ছাড়া কেউ কি লিখেছিল?'

'তা লিখেছে। মনে হচ্ছে এ দেশের মেয়েদের কাজকর্ম বিশেষ নেই। সুযোগ পেলেই ওরা চিঠি লেখে। এই কথা বললাম বলে তুমি আবার রাগ করলে না তো?'

'নাহ্।'

'গুড। আমি কিন্তু শুধু তোমার চিঠির জবাব দিয়েছি। অন্য কারোর চিঠির জবাব দিই নি। আমার কথা বিশ্বাস করছ তো?'

'করছি।'

বেয়ারা চায়ের পট দিয়ে গেল। ছেলেটি বলল, 'দাও, আমি চা বানিয়ে দিচ্ছি। ঘরে বানাবে মেয়েরা, কিন্তু বাইরে পুরুষেরা—এ-ই নিয়ম।'

নীলু লক্ষ্য করল, ছেলেটি তার কাপে তিন চামচ চিনি দিয়েছে। নীলু এক বার লিখেছে সে চায়ে তিন চামচ চিনি খায়। ছেলেটি সেটা মনে রেখেছে। কী আশ্চর্য!

'চায়ে এত চিনি খাওয়া কিন্তু ভালো না।'

নীলু কিছু বলল না।

'এর পর থেকে চিনি কম খাবে।'

নীলু ঘাড় নাড়ল।

তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে রইল। নীলু একবার বলল, 'সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, উঠি?'

ছেলেটি বলল, 'আরেকটু বস, আমি বাসায় পৌঁছে দেব, আমার সঙ্গে গাড়ি আছে।' নীলু আর কিছু বলল না।

'একটু দেরি হলে তোমাকে আবার বাসায় বকবে না তো?'

'নাহ্, বকবে না। আমি মাঝে-মাঝে অনেক রাত করে বাসায় ফিরি।'

'সেটা ঠিক না নীলু। শহর বড় হচ্ছে, ক্রাইম বাড়ছে। ঠিক না?'

'হ্যাঁ, ঠিক।'

'ঐ দিন কী হলো জান— আমার পরিচিত এক মহিলার কান থেকে টেনে দুল নিয়ে গেছে, রক্তারক্তি কাণ্ড!'

'আমি বাইরে গেলে গয়নাটয়না পরি না।'

'না-পরাই উচিত। আচ্ছা নীলু, তুমি কি আজ তোমার বাবার সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দেবে?'

'আপনি যদি চান, দেব।'

'আমি নিশ্চয়ই চাই। তুমি কি চাও?'

'চাই' বলতে গিয়ে নীলুর চোখ ভিজে উঠল। ছেলেটিকে এখন কত-না পরিচিত মনে হচ্ছে! সে যদি এখন হাত বাড়িয়ে নীলুর হাত স্পর্শ করে, তাহলে

কেমন লাগবে নীলুর? ভালোই লাগবে। কিন্তু ছেলেটি অত্যন্ত ভদ্র। সে এমন কিছুই করবে না।

'নীলু, আমি তোমার জন্যে একটা উপহার এনেছিলাম। কিন্তু তার আগে বল, তুমি কী এনেছ? তুমি বলেছিলে লাল টাই আনবে। ভুলে গেছ, না?'

'না, ভুলব কেন?

'আমি তোমার জন্যেই লাল টাই পরে এসেছি। যদিও লাল রং আমার পছন্দ নয়। আমার পছন্দ হচ্ছে—নীল।'

'নীল আমারও পছন্দ।'

'তবে হাল্‌কা নীল, কড়া নীল নয়।'

নীলু এই প্রথম অল্প হাসল। হাল্‌কা নীল তার নিজেরও পছন্দ। ছেলেটি হাসতে-হাসতে বলল, 'আমার সবচে' অপছন্দ হচ্ছে সবুজ রং। কিন্তু দেখ, আজ সবুজ রংটাও খারাপ লাগছে না।'

তারা উঠে দাঁড়াল সাড়ে আটটার দিকে। হেঁটে-হেঁটে এল নিউমার্কেটের গেটে। ছোট্ট একটা হোন্ডা সিভিক সেখানে পার্ক করা। ছেলেটি ঘড়ি দেখে বলল, 'রাত কি বেশি হয়ে গেল নীলু?'

'না, বেশি হয় নি।'

'তোমার বাবা দুশ্চিন্তা না-করলে হয়। আমি চাই না আমার জন্যে কেউ বকা খাক। অবশ্যি এক-আধ দিন বকা খেলে কিছু যায়-আসে না, কি বল?'

নীলু হাসল। ছেলেটিও হাসল। মার্জিত হাসি।

'সরাসরি বাসায় যাবে, নাকি যাবার আগে আইসক্রীম খাবে? ধানমণ্ডিতে একটা ভালো আইসক্রীমের দোকান দিয়েছে।'

'আজ আর যাব না।'

'ঠিক আছে, চল বাসায় পৌছে দিই।'

ছেলেটি নীলুকে তাদের গেটের কাছে নামিয়ে দিল। নীলুর খুব ইচ্ছে করছিল তাকে বসতে বলে, কিন্তু তার বড্ড লজ্জা করল। বিলু নানান প্রশ্ন শুরু করবে।

১৫

'স্যার, ভেতরে আসব?'

'এস। কী ব্যাপার?'

মিসির আলি মেয়েটিকে ঠিক চিনতে পারলেন না। তিনি কখনো তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের চিনতে পারেন না।

'স্যার, আমার নাম নীলু, নীলুফার।'

'ও, আচ্ছা।'

মিসির আলি পরিচিত ভঙ্গিতে হাসলেন কিন্তু নামটি তাঁর কাছে অপরিচিত লাগছে। এও এক সমস্যা। কারো নাম তিনি মনে রাখতে পারেন না। তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। নাম মনে না করতে পারার একটিই কারণ—মানুষের প্রতি তাঁর আগ্রহ নেই। আগ্রহ থাকলে নাম মনে থাকত।

'স্যার, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন? আমি সেকেন্ড ইয়ারের। এক দিন এসেছিলাম আমরা চার বন্ধু।'

'ও হ্যাঁ। এসেছিলে তোমরা। মনে পড়েছে। আজ কী ব্যাপার?'

'মেয়েটি ইতস্তত করতে লাগল। তার মানে কী? কমবয়েসী মেয়েদের তিনি এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেন। তরলমতি মেয়েরা মাঝে-মাঝে অনেক অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করে বসে।

'তোমার কী ব্যাপার, বল।'

'স্যার, আমি ঐ ইএসপির টেস্টটা আবার দিতে চাই।'

'এক বার তো দিয়েছ। আবার কেন?'

মিসির আলি বিস্মিত হলেন। এই মেয়েটির মতিগতি তিনি বুঝতে পারছেন না।

'স্যার, আমার মনে হয়, এবার পরীক্ষা করলে দেখা যাবে—আমার ইএসপি আছে।'

'এ রকম মনে হবার কারণ কী?'

মেয়েটি উত্তর না-দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। লক্ষণ ভালো নয়। মিসির আলি গম্ভীর গলায় বললেন, 'এখন আমি একটু ব্যস্ত আছি। অন্য এক দিন এস।'

মেয়েটি তবুও কিছু সময় দাঁড়িয়ে রইল।

'তুমি কি অন্য কিছু বলতে চাও?'

'জ্বি-না স্যার। আমি যাই। স্লামালিকুম।'

মিসির আলি গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। এ মেয়েটিকে প্রশ্রয় দেয়া ঠিক হবে না। এরা সহজেই একটা ঝামেলা বাধিয়ে দিতে পারে। এ রকম সুযোগ দেয়া ঠিক না।

বারটায় একটা ক্লাস ছিল। মিসির আলি গিয়ে দেখলেন কোনো ছাত্র-ছাত্রী নেই। কোনো স্ট্রাইক হচ্ছে কি? এ রকম কিছু শোনেন নি। সামনে হয়তো টার্ম পরীক্ষা আছে। টার্ম পরীক্ষা থাকলে ছাত্ররা দল বেঁধে আসা বন্ধ করে দেয়। মিসির আলি ভ্রূকুঁচকে খালি ক্লাসে মিনিট পাঁচেক বসে রইলেন। গত রাতে অসুস্থ শরীরে এই ক্লাসটির জন্যে পড়াশোনা করেছেন। এ অবস্থা হবে জানলে সকাল-

সকাল শুয়ে পড়তে পারতেন। ছাত্রশূন্য একটি ক্লাসে তিনি খাতাপত্র নিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে আছেন—হাস্যকর দৃশ্য। অনেকেই করিডোর দিয়ে হাঁটবার সময় তাঁকে কৌতূহলী হয়ে দেখল। পাগলটাগল ভাবছে বোধহয়। মিসির আলি উঠে পড়লেন।

আজকের দিনটিই শুরু হয়েছে খারাপভাবে। একটি কাজও ঠিকমতো হচ্ছে না। মিসির আলি ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। তাঁর কপালের মাঝখানে ব্যথা শুরু হলো। এই উপসর্গটি নতুন। ব্লাড-প্রেশারট্রেশার হয়েছে বোধহয়। ডাক্তার দেখাতে হবে।

তিনি বাড়ি ফিরলেন তিনটার দিকে। এই অসময়েও বসার ঘরে কে যেন বসে আছে। সমস্ত দিনটিই যে খারাপ যাবে, এটা হচ্ছে তার প্রমাণ। গ্রামের বাড়ি থেকে টাকা-পয়সা চাইতে কেউ এসেছে নির্ঘাত।

'কে?'

'জ্বি, আমি আনিস।'

'আনিস সাহেব, আপনি এই সময়ে! অফিস নেই?'

'ছুটি নিয়ে এলাম।'

'ব্যাপার কী?'

'রানুর শরীরটা বেশি খারাপ। ভাবলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই।'

'ভালোই করেছেন। বসেন, চা-টা দিয়েছে?'

'জ্বি, চা খেয়েছি। আপনার ভাই ছিলেন এতক্ষণ।'

'বসুন, আমি কাপড় ছেড়ে আসি।'

লোকটি জড়সড় হয়ে বসে আছে। মিসির আলি লক্ষ্য করলেন, তার চোখের নিচে কালি পড়েছে। তার মানে রাতে ঘুমাতে পারছে না। এ রকম হওয়ার কথা নয়। মিসির আলি চিন্তিত মুখে ভেতরে ঢুকলেন। তাঁর ফিরে আসতে অনেক সময় লাগল।

'এখন বলেন, ব্যাপারটা কী?'

আনিস ইতস্তত করে বলল, 'ভূতপ্রেত বলে সত্যি কিছু আছে?'

'এই কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

আনিস মুখ কালো করে বলল, 'অনেক রকম কাণ্ডকারখানা হচ্ছে। আমি কনফিউজড হয়ে গেছি।'

'অর্থাৎ এখন ভূতপ্রেত বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন?'

আনিস চুপ করে রইল।

'এর কারণটা বলেন, শুনি।'

'নানারকম শব্দ হয় ঘরে।'

'তাই নাকি? আপনি নিজে শোনেন?'

'জ্বি, শুনি। গন্ধও পাই, ফুলের গন্ধ।'

'আপনি পান, না আপনার স্ত্রী পান?'

'রানু প্রথম পায়, তারপর আমি পাই।'

মিসির আলি চুরুট ধরালেন। আনিস বলল, 'গত রাতে ঘরের মধ্যে কেউ যেন নূপুর পায়ে হাঁটছিল।'

'এই নূপুরের শব্দ প্রথম কে শোনে? আপনার স্ত্রী?'

'জ্বি।'

'তারপর আপনাকে বলার পর আপনি শুনতে পান।'

'জ্বি।'

'আনিস সাহেব, এটাকে বলা হয় ইনডিউসড অডিটরি হেলুসিনেশন। আপনার মন দুর্বল। আপনার স্ত্রী যখন বলেন শব্দ শুনতে পাচ্ছেন, তখন আপনিও তা শুনতে থাকেন। ব্যাপারটি আপনার মনোজগতে। আসলে কোনো শব্দ হচ্ছে না।'

আনিস দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, 'আপনি যদি একবার আসেন আমাদের বাসায়, আপনি নিজেও শুনবেন।'

'না ভাই, আমি শুনব না। আমি খুব শক্ত ধরনের মানুষ। খুবই যুক্তিবাদী লোক আমি।'

'আপনি আসেন-না এক বার।'

'ঠিক আছে, যাব।'

'কবে আসবেন? আজ আসতে পারবেন?'

'আমি কাল-পরশুর মধ্যে একবার যাব।'

'আমাদের বাড়িঅলার খুব সুন্দর ফুলের বাগান আছে। প্রচুর গোলাপও আছে। বিকেলের দিকে গেলে সেটাও দেখতে পারবেন।'

মিসির আলি কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বড় ফুলের বাগান?'

'জ্বি।'

'আনিস সাহেব, এমন কি হতে পারে না, বাতাসে নিচের বাগান থেকে ফুলের সৌরভ ভেসে আসে? সেই সৌরভকে আপনি একটি আধ্যাত্মিক রূপ দেন। হতে পারে?'

'পারে, কিন্তু শব্দটা?'

'কোনো একটা ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে। মস্তিষ্ক খুব অদ্ভুত জিনিস, আনিস সাহেব। সে আপনাকে এমন সব জিনিস দেখাতে বা শোনাতে পারে, যার আসলে কোনো অস্তিত্ব নেই। আপনি কি উঠছেন?'

'জ্বি।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, যান। আমার নিজেরও মাথা ধরেছে। দুটো পেরাসিটামল খেয়েছি, লাভ হচ্ছে না। জ্বরও আসছে বলে মনে হয়। শরীরটা গেছে। বেশি দিন বাঁচব না।'

১৬

পত্রিকা খুলে নীলু অবাক হলো। সেই বিজ্ঞাপনটি আবার ছাপা হয়েছে। কথাগুলো এক। জিপিও বক্স নাম্বারও ৭৩। শিরোনমটিও আগের মতো—কেউ কি আসবেন?' এর মানে কী? নীলুর ধারণা ছিল, এই বিজ্ঞাপনটি আর কোনো দিন ছাপা হবে না। এর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু এখন তা মনে হচ্ছে না। নীলুর ইচ্ছা হলো দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ কাঁদার। সে মুখ কালো করে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বারান্দায় তার জন্যে একটা বড় ধরনের চমক অপেক্ষা করছিল। মিসির আলি সাহেব দাঁড়িয়ে। তিনি বললেন, 'এখানে কি আনিস সাহেব থাকেন?'

'স্যার আপনি? আমাকে চিনতে পেরেছেন?'

'ও ইয়ে, তুমি। আমার ছাত্রী? কোন ইয়ার?'

'থার্ডইয়ার স্যার। নীলু আমার নাম। নীলুফার।'

'ও আচ্ছা। নীলুফার—তোমাদের তেতলায় আনিস সাহেব থাকেন নাকি?'

'জ্বি।'

'তাঁর কাছে এসেছি। উঠবার রাস্তা কোন দিকে?'

নীলু তাঁকে সঙ্গে করে তিনতলায় নিয়ে গেল।

'ফেরবার পথে আমাদের বাসা হয়ে যাবেন স্যার। যেতেই হবে।'

'আচ্ছা, দেখি।'

'দেখাদেখি না স্যার, আপনি আসবেন।'

আনিস ঘরে ছিল না। রানু তাঁকে নিয়ে বসাল। সে খুবই অবাক হয়েছে। মিসির আলি বললেন, 'খুব অবাক হয়েছেন মনে হচ্ছে?'

'আপনি-আপনি করে বলছেন কেন?'

'ও আচ্ছা, তুমি-তুমি করে বলতাম, তাই না? ঠিক আছে। এখন বল, আমাকে দেখে অবাক হয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'খুব অবাক হয়েছ?'

'জ্বি। আপনি আসবেন ভাবতেই পারি নি।'

মিসির আলি সিগারেট ধরিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'তুমি তো শুনেছি সব কিছু আগে বলে দিতে পার, এটি তো পারার কথা ছিল।'

রানু থেমে-থেমে বলল, 'আপনি লোকটি বেশ অদ্ভুত!'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আপনার যুক্তিও খুব ভালো, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়।'

'বিশ্বাস করলেই পার। আনিস সাহেব কখন আসবেন?'

'এসে পড়বে।'

'আমাকে একটু চা খাওয়াও। আর শোন, তোমাদের একটা কাজের ছেলে আছে নাকি? ওকে পাঠাও তো আমার কাছে।'

'ওকে কী জন্যে?'

'কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

মিসির আলি : কি নাম?

জিতু : জিতু মিয়া।

মিসির আলি : দেশ কোথায়?

জিতু : টাঙ্গাইল।

মিসির আলি : শুনলাম দুই-এক দিন আগে তুমি নাকি রাতের বেলা কি-একটা দেখে ভয় পেয়েছ?

জিতু : জ্বি, পাইছি।

মিসির আলি : কী দেখেছ?

জিতু : পাকের ঘরে এক জন মেয়েমানুষ। হাঁটাচলা করতাছে।

মিসির আলি : সুন্দরী?

জিতু : জ্বি, খুব সুন্দর!

মিসির আলি : রান্নাঘরে তো বাতি জ্বালানো ছিল?

জিতু : জ্বি-না।

মিসির আলি : অন্ধকারে তুমি মানুষ কীভাবে দেখলে?

জিতু : নিশ্চুপ।

মিসির আলি : আমার মনে হয় জিনিসটা তুমি স্বপ্নে দেখেছ।

জিতু : নিশ্চুপ।

মিসির আলি : আচ্ছা জিতু মিয়া, তুমি যাও। শোন, এক প্যাকেট সিগারেট

নিয়ে এস আমার জন্যে। ক্যাপস্টান। নাও, টাকাটা নাও।

জিতু মিয়া চলে গেল। রানু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ইউনিভার্সিটির সব মাস্টাররাই কি আপনার মতো বুদ্ধিমান?'

'না। আমার নিজের বুদ্ধি একটু বেশি। আচ্ছা, এখন যে খুটখাট শব্দ শোনা যাচ্ছে, এই শব্দটার কথাই কি আনিস সাহেব আমাকে বলেন?'

রানু জবাব দিল না। মিসির আলি কান পেতে শুনলেন।

'শব্দটা তো বেশ স্পষ্ট। রান্নাঘর থেকে আসছে না?'

'হুঁ।'

'এই শব্দটার কথাই আনিস সাহেব বলেন, তাই না?'

'বোধহয়। আপনি রান্নাঘর দেখবেন? আপনি যাওয়ামাত্রই শব্দ থেমে যাবে।'

'শব্দটা বেশির ভাগই রান্নাঘরে হয়?'

'জ্বি।'

'ইঁদুর-মরা কিছু বিষ ছড়িয়ে দিও, আর শব্দ হবে না। ওটা ইঁদুরের শব্দ। রান্নাঘরে খাবারের লোভে ঘোরাঘুরি করে। সে জন্যেই শব্দটা বেশি হয় রান্নাঘরে। বুঝলে?'

'হুঁ।'

'যুক্তিটা পছন্দ হচ্ছে না মনে হয়।'

'যুক্তি ভালোই। আরেক কাপ চা খাবেন?'

'নাহ্, এখন উঠব। আনিস সাহেব মনে হয় আজ আর আসবেন না।'

'না, আপনি আরেকটু বসুন। আপনাকে একটা গল্প বলব।'

'আজ আর না, রানু। মাথা ধরেছে।'

'মাথা ধরলেও আপনাকে শুনতে হবে। বসুন, আমি চা আনছি। প্যারাসিটামল খাবেন?'

'ঠিক আছে।'

চা আনবার আগেই আনিস এসে পড়ল। তার অফিসে নাকি কী-একটা ঝামেলা হয়েছে। দশ হাজার টাকার একটা চেকের হিসেবে গণ্ডগোল। চেকটা ইস্যু হয়েছে আনিসের অফিস থেকে। আনিসের চোখে-মুখে ক্লান্তি। মিসির আলি বললেন, 'আপনি বিশ্রামটিশ্রাম করেন। আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না। আমি রানুর কাছ থেকে একটা গল্প শুনব।'

'কী গল্প?'

'জানি না কী গল্প। ভয়ের কিছু হবে।'

রানু বলল, 'না, ভয়ের না। তুমি গোসলটোসল সেরে এসে চা খাও।'

'আমি গল্পটা শুনতে পারব না?'

'নাহ্। সব গল্প সবার জন্যে না।'

আনিসের কপালে সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়ল। সে কিছু বলল না। বাথরুমে ঢুকে পড়ল। রানু তার গল্প শুরু করল খুব শান্ত গলায়। মিসির আলি তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

রানুর দ্বিতীয় গল্প

আমার তখন মাত্র বিয়ে হয়েছে। সপ্তাহখানেকও হয় নি। সেই সময় এক কাণ্ড হলো।

আমার বিয়ে হয়েছিল শ্রাবণ মাসের ছ' তারিখে। ঘটনাটা ঘটল শ্রাবণ মাসের চোদ্দ তারিখ। সকালবেলা আমার এক মামাশ্বশুর এসে ওকে নিয়ে গেলেন মাছ মারতে। নৌকায় করে মাছ মারা হবে। নৌকা বড় গাঙ দিয়ে যাবে সোনাপোতার বিলে। বঁড়শি ফেললেই সেখানে বড়-বড় বোয়াল মাছ পাওয়া যায়। বর্ষাকালে বোয়ালের কোনো স্বাদ নেই জানেন তো? কিন্তু সোনাপোতার বোয়ালে বর্ষাকালেই নাকি সবচেয়ে বেশি তেল হয়।

দুপুরের পর থেকেই হঠাৎ করে খুব দিন-খারাপ হলো। বিকেল থেকে বাতাস বইতে লাগল। আমরা সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ওরা আর ফেরে না। সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হলো প্রচণ্ড ঝড়। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল।

আমাদের বাড়িটা হচ্ছে কাঠের। কাঠের দোতলা। আমি একা-একা দোতলায় উঠে গেলাম। দোতলার কোণার দিকের একটা ঘরে আজেবাজে জিনিস রাখা হয়। স্টোররুমের মতো। কেউ সেখানে যায়টায় না। আমি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে কাঁদতে শুরু করলাম। তখন হঠাৎ একটি মেয়ের কথা শুনতে পেলাম। মেয়েটি খুব নিচুস্বরে বলল—সোনাপোতার বিলে ওদের নৌকা ডুবে গেছে। কিছুক্ষণ আগেই ডুবেছে। এটা শোনার পর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই।

মিসির আলি বললেন, 'এইটুকুই গল্প?'

'হ্যাঁ।'

'গল্পের কোনো বিশেষত্ব লক্ষ্য করলাম না।'

'বিশেষত্ব হচ্ছে, সেদিন সন্ধ্যায় ওদের সত্যি-সত্যি নৌকাডুবি হয়েছিল। এর কোনো ব্যাখ্যা আছে আপনার কাছে?'

'আছে। ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল, কাজেই তোমার মনে ছিল অমঙ্গলের আশঙ্কা। অবচেতন মনে ছিল নৌকাডুবির কথা। অবচেতন মনই কথা বলেছে তোমার সঙ্গে। মানুষের মন খুব বিচিত্র রানু। আমি উঠলাম।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। রানু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'একতলার নীলু নামের যে মেয়েটি আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে, সে আপনার জন্যে বারান্দায় অপেক্ষা করছে। যাবার সময় ওর সঙ্গে আপনার দেখা হবে।'

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তাতে কি?'

রানু বলল, 'নীলু এই মুহূর্তে কী ভাবছে তা আমি বলতে পারব। ওকে জিজ্ঞেস করলেই দেখবেন আমি ঠিকই বলেছি। আমি অনেক কিছুই বলতে পারি।'

'নীলু কী ভাবছে?'

'নীলু ভাবছে এক জন অত্যন্ত সুপুরুষ যুবকের কথা।'

'সেটা তো স্বাভাবিক। এক জন অবিবাহিত যুবতী এক জন সুপুরুষ যুবকের কথাই ভাবে। এটা বলার জন্যে কোনো অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দরকার হয় না, রানু।'

মিসির আলি নেমে গেলেন। নীলু সত্যি-সত্যি বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। সে খুব অনুরোধ করল যাতে স্যার এক কাপ চা খেয়ে যান, কিন্তু মিসির আলি বসলেন না। তাঁর প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। প্যারাসিটামল কাজ করছে না। সারা জীবন তিনি এত অষুধ খেয়েছেন যে অষুধ তাঁর ওপর এখন আর কাজ করে না। খুব খারাপ লক্ষণ।

১৭

নীলুর বাবা বারান্দায় বসেছিলেন। নীলুকে বেরুতে দেখে তিনি ডাকলেন, 'নীলু, কোথায় যাচ্ছ মা?'

'একটু বাইরে যাচ্ছি।'

কিন্তু এইটুকু বলতেই নীলুর গলা কেঁপে গেল। গাল লাল হলো। তিনি তা লক্ষ্য করলেন। বিস্মিত গলায় বললেন, 'বাইরে কোথায়?' নীলু জবাব দিল না।

'কখন ফিরবে মা?'

'আটটা বাজার আগেই ফিরব।'

'গাড়ি নিয়ে যাও।'

'গাড়ি লাগবে না। তোমার কিছু লাগবে বাবা, চা বানিয়ে দিয়ে যাব?'

'না, চা লাগবে না। একটু সকাল-সকাল ফিরিস মা। শরীরটা ভালো না।'

'সকাল-সকালই ফিরব।'

বিকেলের আলো নরম হয়ে এসেছে। সব কিছু দেখতে অন্য রকম লাগল নীলুর চোখে। নিউ মার্কেটের পরিচিত ঘরগুলোও যেন অচেনা। যেন ওদের এক ধরনের রহস্যময়তা ঘিরে আছে।

'কেমন আছ নীলু?'

নীলু তৎক্ষণাৎ তাকাতে পারল না। তার লজ্জা করতে লাগল। তার ভয় ছিল আজ হয়তো সে আসবে না। প্রিয়জনদের দেখা তো এত সহজে পাওয়া যায় না।

'আজ তুমি দেরি করে এসেছ। পাঁচ মিনিট দেরি। তোমার তার জন্যে শাস্তি হওয়া দরকার।'

'কী শাস্তি?'

'সেটা আমরা চা খেতে-খেতে ঠিক করব। খুব চায়ের পিপাসা হয়েছে।'

'কোথায় চা খাবেন?'

'এখানে কোথাও। আর শোন নীলু, চা খেতে-খেতে তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাই। খুব জরুরি কথা।'

'এখন বলুন। হাঁটতে-হাঁটতে বলুন।'

'নাহ্। এই কথা হাঁটতে-হাঁটতে বলা যায় না। বলতে হয় মুখোমুখি বসে। চোখের দিকে তাকিয়ে।'

নীলুর কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমল। নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এল। সে কোনোমতে বলল, 'ঠিক আছে, চলুন কোথাও বসি।'

'কি বলতে চাই তা কি বুঝতে পারছ?'

'নাহ্।'

'বুঝতে পারছ, নীলু। মেয়েরা এইসব জিনিস খুব ভালো বুঝতে পারে।'

নীলুর গা কাঁপতে লাগল। অন্য এক ধরনের আনন্দ হচ্ছে। অন্য এক ধরনের সুখ। মনে হচ্ছে পৃথিবীতে এখন আর কেউ নেই। চারিদিকে সীমাহীন শূন্যতা। শুধু তারা দুই জন হাঁটছে। হেঁটেই চলেছে। কেমন যেন এক ধরনের কষ্টও হচ্ছে বুকের মধ্যে।

ওরা একটি রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসল।

'চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবে?'

'না।'

'খাও না! কিছু খাও।'

সে বয়কে ডেকে কী যেন বলল। নীলু শুনতে পেল না। কোনো কিছুতেই তার মন বসছে না। সব তার কাছে অস্পষ্ট লাগছে।

'কি নীলু, কিছু বল। চুপ করে আছ কেন?'

'কী বলব?'

'যা ইচ্ছা বল।'

নীলু ইতস্তত করে বলল, 'আপনি ঐ বিজ্ঞাপনটা আবার দিয়েছেন কেন?'

সে হাসল শব্দ করে।

'দেখেছ বিজ্ঞাপনটা?'

'হ্যাঁ।'

'মন-খারাপ হয়েছে?'

'নীলু কিছু বলল না।

'বল, মন-খারাপ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

সে আবার শব্দ করে হাসল। তার পর ফুর্তিবাজের ভঙ্গিতে বলল, 'আমি পত্রিকার অফিসে টাকা দিয়ে রেখেছিলাম। কথা ছিল প্রতি মাসে দুই বার করে ছাপবে। তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর তার আর প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু সেটা বলা হয় নি। আগামী কাল বন্ধ করে দেব। এখন খুশি তো?'

নীলু জবাব দিল না।

'বল, এখন তুমি খুশি? এইভাবে চুপ করে থাকলে হবে না, কথা বলতে হবে। বল, তুমি খুশি?'

'হুঁ।'

সে আরেক দফা চায়ের অর্ডার দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। খানিকক্ষণ দুই জনেই কোনো কথা বলল না। বাইরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। পৃথিবী বড় সুন্দর গ্রহ। এতে বেঁচে থাকতে সুখ আছে।

'নীলু।'

'হুঁ।'

'তোমাকে যে কথাটি আমি বলতে চাচ্ছিলাম সেটি বলি?'

'বলুন।'

'দেখ নীলু, সারা জীবন পাশাপাশি থেকেও এক সময় একজন অন্যজনকে চিনতে পারে না। আবার এমনও হয়, এক পলকের দেখায় একে অন্যকে চিনে ফেলে। ঠিক না?'

নীলু জবাব দিল না।

'বল, ঠিক না?'

'হ্যাঁ।'

তোমাকে প্রথম দিন দেখেই...'

সে চুপ করে গেল। নীলুর চোখে জল এল।

'নীলু, আজ যদি তোমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, তাহলে তোমার আপত্তি আছে?'

নীলু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। জবাব দিল না। সে মুখ ঘুরিয়ে বসেছিল। সে তার চোখের জল তাকে দেখাতে চায় না।

'বল নীলু, আপত্তি আছে?'

'আমাকে আটটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে।'

'আটটার আগেই আমরা বাড়ি ফিরব। এস উঠি।'

সে নীলুর হাত ধরল। ভালবাসার স্পর্শ, যার জন্যে তরুণীরা সারা জীবন প্রতীক্ষা করে থাকে।

১৮

রানু আজ অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম যখন ভাঙল তখন দিন প্রায় শেষ। আকাশ লালচে হতে শুরু করেছে। সে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নিচের বারান্দায় বিলু হাঁটছে একা-একা। রানুর কেমন জানি অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। যেন কোথাও কিছু-একটা অস্বাভাবিকতা আছে, সে ধরতে পারছে না। নিচে থেকে বিলু ডাকল, 'রানু ভাবী, চা খেলে নেমে এস, চা হচ্ছে।'

'চা খাব না।'

'আস না বাবা! ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার বলব। কুইক।'

রানু নেমে গেল। তার মাথায় সূক্ষ্ম একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। কিছুই ভালো লাগছে না। বমিবমি ভাব হচ্ছে।

বারান্দায় নীলুর বাবাও ছিলেন। ওপর থেকে তাঁকে দেখা যায় নি। তিনি নরম স্বরে বললেন, 'এখন তুমি কেমন আছ মা?'

'জ্বি, ভালো।'

'আমি আনিস সাহেবকে বলেছি বড় একজন ডাক্তার দেখাতে। পিজির একজন প্রফেসর আছেন, আমার আত্মীয়, তাঁকে আমি বলে দেখতে পারি। তুমি আলাপ করো আনিসের সাথে, কেমন?'

'জ্বি, করব।'

বিলু বলল, 'বাবা, ঘরে গিয়ে তুমি চা খাও। তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে। আমরা দুই জন বাগানে বসি।' ভদ্রলোকে চলে গেলেন সঙ্গে-সঙ্গে।

রানু বলল, 'নীলু কোথায়?'

'ওর এক বন্ধুর বাড়ি গেছে।'

বন্ধুর বাড়ি যাওয়া এমন কোনো ব্যাপার নয়, তবু কেন জানি রানুর বুকে ধক করে একটা ধাক্কা লাগল। ভোঁতা এক ধরনের যন্ত্রণা হতে লাগল মাথায়। বিলু বলল, 'রানু ভাবী, তোমাকে একটা গোপন কথা বলছি। টপ সিক্রেট, কাউকে বলবে না।'

'না, বলব না।'

'ইভেন নীলু আপাকেও নয়। কারণ কথাটা তাকে নিয়েই।'

'ঠিক আছে, কাউকে বলব না।'

'নীলু আপা ডুবে-ডুবে জল খাচ্ছে। আজকে সকালে টের পেয়েছি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। নীলু আপার ট্রাঙ্ক ঘাঁটতে গিয়ে আবিষ্কার করেছি। জনৈক ভদ্রলোক দারুণ সব রোমান্টিক চিঠি লিখেছে নীলু আপাকে। খুব লদকালদকি।'

বিলু হাসল। রানু কিছু বলল না। তার মাথার যন্ত্রণাটা ক্রমেই বাড়ছে।

'দু একটা চিঠি পড়ে দেখতে চাও?'

'না, না। অন্যের চিঠি।'

'আহ্, পড় না, কেউ তো জানতে পারছে না। আমরা ব্যাপারটা টপ সিক্রেট রাখব, তাহলেই তো হলো।'

'না বিলু, আমি চিঠি পড়ব না।'

'পড়ব না বললে হবে না। পড়তেই হবে। দাঁড়াও আমি নিয়ে আসছি। যে আলো আছে তাতে দিব্যি পড়তে পারবে।'

বিলু ঘর থেকে চিঠি নিয়ে এল। রানু চিঠিটি হাতে নিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিলু অবাক হয়ে বলল, 'কী হয়েছে?'

'না, কিছু হয় নি।'

'এ রকম করছ কেন?'

'মাথা ধরেছে। বড্ড মাথা ধরেছে।'

'প্যারাসিটামল এনে দেব? তুমি চিঠিটা পড়ে আমাকে বল ভদ্রলোক সম্পর্কে তোমার কী ধারণা।'

রানু চিঠি পড়ল। বিলু বলল, 'বল, তোমার কী মনে হয়?'

রানু কিছু বলল না। এক হাতে মাথার চুল টেনে ধরল।

'তোমার কী হয়েছে?'

'বড্ড শরীর খারাপ লাগছে। আমি এখন যাই।'

'চা খাবে না?'

'না। বিলু, নীলু কখন ফিরবে—বলে গেছে?'

'না। সন্ধ্যার আগে-আগেই ফিরবে বোধহয়। তোমার কি শরীর বেশি খারাপ লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে যাও, শুয়ে থাক গিয়ে।'

রানু উপরে উঠে এল। ঘর অন্ধকার। বাতি জ্বালাতে ইচ্ছে হলো না। শুয়ে পড়ল বিছানায়। আনিস আজ ফিরতে দেরি করবে। তার অফিসে কী-সব নাকি ঝামেলা হচ্ছে। রানু ডাকল, 'জিতু—জিতু মিয়া।' কেউ সাড়া দিল না। জিতু কি বাসায় নেই? 'জিতু—জিতু।' কোনো উত্তর নেই। জিতু মিয়া ইদানীং বেশ লায়েক হয়েছে। রানু কিছু বলে না বলেই হয়তো বিকেলে খেলতে গিয়ে সন্ধ্যা পার করে বাড়ি ফেরে। বকাঝকা তার গায়ে লাগে না।

রান্নাঘরে খুটখুট শব্দ হচ্ছে। ইঁদুর। নিশ্চয়ই ইঁদুর। তবু রানু বলল, 'কে?' খুটখুট শব্দ থেমে গেল। ইঁদুর ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু সেই গন্ধটা আবার পাওয়া যাচ্ছে। কড়া ফুলের গন্ধ। রানুর ইচ্ছে হলো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। রানু দুর্বল গলায় ডাকল, 'জিতু, জিতু মিয়া।' আর ঠিক তখন কে-একজন ডাকল, 'রানু—রানু।' এই ডাক রানুর চেনা। এই জীবনে সে অনেক বার শুনেছে। তবে এটা কিছু নয়। প্রফেসর সাহেব বলছেন, 'অডিটরি হেলুসিনেশন'। আসলেই তাই। এ ছাড়া আর কিছু নয়।

'রানু—রানু।'

'কে? তুমি কে?'

রানুর মনে হলো কেউ-একজন যেন এগিয়ে আসছে। তার পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ছোট্ট-ছোট্ট পা নিশ্চয়ই। হালকা শব্দ। পায়ে কি নূপুর আছে? নূপুর বাজছে?

'রানু।'

রানু চোখ বন্ধ করে ফেলল। এ সব সত্যি নয়, চোখের ভুল। রানু দুর্বল গলায় বলল, 'তুমি কে?'

'আমাকে তুমি চিনতে পারছ না?'

'না।'

কিশোরীর গলায় মৃদু হাসি শোনা গেল।

'তাকাও রানু। তাকালেই চিনবে।'

'আমি চিনতে চাই না।'

'তোমার বন্ধু নীলুর খুব বিপদ, রানু। এক দিন তোমার যে বিপদ ঘটতে যাচ্ছিল, তার চেয়েও অনেক বড় বিপদ।'

দরজায় ধাক্কা পড়ছে। জিতু এসেছে বোধহয়। রানু তাকাল, কোথাও কেউ নেই। ফুলের গন্ধ কমে আসছে। জিতু মিয়া বাইরে থেকে ডাকল, 'আম্মা, আম্মা।' রানু উঠে দরজা খুলল।

'আপনের কী হইছে?'

'কিছু হয় নি।'

রানু এসে শুয়ে পড়ল। তার গায়ে প্রচণ্ড জ্বর। সে বিছানায় ছটফট করতে লাগল। কখন আসবে আনিস? কখন আসবে?

'জিতু।'

'জ্বি।'

'নিচে গিয়ে দেখে আয় তো—নীলু ফিরেছে নাকি।'

জিতু ফিরে এসে জানাল, এখনও আসে নি। রানু একটি নিঃশ্বাস ফেলে ঘড়ি দেখল, আটটা বাজতে চার মিনিট বাকি। কখন আসবে আনিস?

১৯

সারাটা পথ নীলু চুপ করে রইল। এক বার সে বলল, 'কী ব্যাপার, এত চুপচাপ যে?' নীলু তারও জবাব দিল না। তার কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না। সে আছে একটা ঘোরের মধ্যে।

'গান শুনবে? গান দেব?'

নীলু মাথা নাড়ল। সেটা হ্যাঁ কি না, তাও স্পষ্ট হলো না।

'কী গান শুনবে? কান্ট্রি মিউজিক? কান্ট্রি মিউজিকে কার গান তোমার পছন্দ?'

নীলু জবাব দিল না।

'আমার ফেবারিট হচ্ছে জন ডেনভার। জন ডেনভারের রকি মাউন্টেন হাই গানটা শুনেছ?'

'না।'

'খুব সুন্দর! অপূর্ব মেলোডি!'

সে ক্যাসেট টিপে দিতেই জন ডেনবারের অপূর্ব কণ্ঠ শোনা গেল, 'ক্যালিফোর্নিয়া রকি মাউন্টেন হাই।'

'কেমন লাগছে নীলু?'

'ভালো।'

'শুধু ভালো না। বেশ ভালো।'

সেও জন ডেনভারের সঙ্গে গুনগুন করতে লাগল। নীলুর মনে হলো ওর গানের গলাও তো চমৎকার! একবার ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করে গান জানেন কি না, কিন্তু সে কিছু জিজ্ঞেস করল না। তার কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। গাড়ি কোন দিক দিয়ে কোথায় যাচ্ছে তাও সে লক্ষ্য করছে না। এক বার শুধু ট্রাফিক সিগনালে গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। এক জন ভিখিরি এসে ভিক্ষা চাইল। সে ধমকে উঠল কড়া গলায়। তারপর আবার গাড়ি চলল। নীলু ফিসফিস করে

বলল, 'কটা বাজে?'

'সাতটা পঁয়ত্রিশ। তোমাকে আটটার আগেই পৌছে দেব।'

'আপনার বাড়ি মনে হয় অনেক দূর?'

'শহর থেকে একটু দূরে বাড়ি করেছি। কোলাহল ভালো লাগে না। ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড কার লেখা জান?'

'নাহ্।'

'টমাস হার্ডির। পড়ে দেখবে, চমৎকার! অথচ ট্রাজেডি হচ্ছে, টমাস হার্ডিকেই নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় নি। তুমি তাঁর কোনো বই পড়েছ?'

'না।'

'পড়ে দেখবে। খুব রোমান্টিক ধরনের রাইটিং।'

গাড়ি ছুটে চলেছে মীরপুর রোড ধরে। হঠাৎ নীলু বলল, 'আমার ভালো লাগছে না।'

'কী বললে?'

'আমার ভালো লাগছে না, আমি বাসায় যাব।'

সে তাকাল নীলুর দিকে। একটি হাত বাড়িয়ে ক্যাসেটের ভল্যুম বাড়িয়ে দিল। গাড়ির গতি কমল না।

'আমি বাসায় যাব।'

'আটটার সময় আমি তোমাকে বাসায় পৌছে দেব।'

'না, আজ আমি কোথাও যাব না। প্লীজ গাড়িটা থামান, আমি নেমে পড়ব।'

'কেন?'

'আমার ভালো লাগছে না। প্লীজ।'

সে তাকাল নীলুর দিকে। নীলু শিউরে উঠল। এ কেমন চাউনি! যেন মানুষ নয়, অন্য কিছু।

'প্লীজ, গাড়িটা একটু থামান।'

'কোনো রকম ঝামেলা না-করে চুপচাপ বসে থাক। কোনো রকম শব্দ করবে না।'

'আপনি এ রকম করে কথা বলছেন কেন?'

গাড়ির গতি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ঝড়ের গতিতে পাশ দিয়ে দুটো ট্রাক গেল। লোকটি তার একটি হাত রাখল নীলুর উরুতে। নীলু শিউরে উঠে দরজার দিকে সরে গেল। লোকটি হাসল। এ কেমন হাসি!

'গাড়ি থামান। আমি চিৎকার করব।'

'কেউ এখন তোমার চিৎকার শুনবে না।'

'আপনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?'

'আমি ভয় দেখাচ্ছি না।'

'আমি আপনাকে বিশ্বাস করে গাড়িতে উঠেছি।'

'আরো কিছুক্ষণ থাক। বেশিক্ষণ নয়, এসে পড়েছি বলে।'

'কী করবেন আপনি?'

'তেমন কিছু না।'

নীলু এক হাতে দরজা খুলতে চেষ্টা করল। লোকটি তাকিয়ে দেখল, কিন্তু বাধা দিল না। দরজা খোলা গেল না। নীলু প্রাণপণে বলতে চেষ্টা করল, আমাকে বাঁচাও, কিন্তু বলতে পারল না। প্রচুর ঘামতে লাগল। প্রচণ্ড তৃষ্ণা বোধ হলো।

২০

আনিস এল রাত সাড়ে আটটায়। ঘর অন্ধকার। কারো কোনো সাড়াশব্দ নেই। রানু বাতিটাতি নিভিয়ে অন্ধকারে বসে আছে। জিতু মিয়া মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়েছে।

'রানু, কী হয়েছে?'

রানু ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, 'তুমি এত দেরি করলে!'

'কেন, কী হয়েছে?'

'নীলুর বড় বিপদ।'

আনিস কিছু বুঝতে পারল না। অবাক হয়ে তাকাল। রানু থেমে-থেমে বলল, 'নীলুর খুব বিপদ।'

'কিসের বিপদ? কী বলছ তুমি?'

রানুর কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। সে গুছিয়ে কিছু বলতে পারছে না।

'রানু, তুমি শান্ত হয়ে বস। তারপর ধীরেসুস্থে বল—কী হয়েছে নীলুর?'

'ও একজন খারাপ লোকের পাল্লায় পড়েছে। লোকটা ওকে মেরে ফেলবে।'

রানু ফোঁপাতে লাগল। আনিস কিছুই বুঝতে পারল না। নীলুর বাবার সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেই তার কথা হয়েছে। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেছেন, 'কি, এত দেরি যে?' যার মেয়ের এত বড় বিপদ, সে এ রকম স্বাভাবিক থাকবে কী করে?

আনিস বলল, 'ওরা তো কিছু বলল না!'

'ওরা কিচ্ছু জানে না। আমি জানি, বিশ্বাস কর—আমি জানি।'

'আমাকে কী করতে বল?'

'আমি বুঝতে পারছি না। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'জিনিসটা কি তুমি স্বপ্নে দেখেছ?'

'না। কিন্তু আমি দেখেছি।'

'কী দেখেছ?'

'আমি সেটা তোমাকে বলতে পারব না।'

'তুমি যদি চাও আমি নিচে গিয়ে ওদের বলতে পারি, কিন্তু ওরা বিশ্বাস করবে না।'

রানু চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে রইল। ওর শরীর অল্প-অল্প করে কাঁপছে। আনিস বলল, 'নাকি মিসির আলি সাহেবের কাছে যাবে? উনি কোনো-একটা বুদ্ধি দিতে পারেন। যাবে?'

রানু কাঁপা গলায় বলল, 'তুমি নিজে কি আমার কথা বিশ্বাস করছ?'

'হ্যাঁ, করছি।'

একতলার বারান্দায় বিলু বসেছিল। ওদের নামতে দেখেই বিলু বলল, 'ভাবী, নীলু আপা এখনো ফিরছে না। বাবা খুব দুশ্চিন্তা করছেন।'

রানু কিছু বলল না।

'তোমরা কোথায় যাচ্ছ ভাবী?'

রানু তারও কোনো জবাব দিল না। রিকশায় উঠেই সে বলল, 'আমাকে ধরে রাখ, খুব ভালো লাগছে।'

আনিস তার কোমর জড়িয়ে বসে রইল। রানুর গা শীতল। রানু খুব ঘামছে। জ্বর নেমে গেছে।

২১

রানু চোখ বড়-বড় করে বলল, 'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না, তাই না?'

মিসির আলি চুপ করে রইলেন।

'আগে আপনি বলুন—আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করছেন?'

'বিশ্বাসও করছি না, আবার অবিশ্বাসও করছি না। তুমি নিজে যা সত্যি বলে মনে করছ, তা-ই বলছ। তবে আমি এত সহজে কোনো কিছু বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু যদি সত্যি হয়, তখন?'

মিসির আলি সিগারেট ধরিয়ে কাশতে লাগলেন।

'বলুন, যদি আমার কথা সত্যি হয়—যদি মেয়েটা মারা যায়?'

মিসির আলি শান্ত স্বরে বললেন, 'ঠিক এই মুহূর্তে কী করা যায়, তা তো বুঝতে পারছি না। মেয়েটি কোথায় আছে, তা তো তুমি জান না। নাকি জান?'

'না, জানি না।'

'ছেলেটির নামধামও জান না?'

'ছেলেটি দেখতে খুব সুন্দর। আমার এ রকম মনে হচ্ছে।'

'এই শহরে খুব কম করে হলেও দশ হাজার সুন্দর ছেলে আছে।'

'আমরা কিছুই করব না?'

'পুলিশের কাছে গিয়ে বলতে পারি একটি মেয়ে হারিয়ে গেছে এবং আশঙ্কা করা যাচ্ছে দুষ্ট লোকের খপ্পরে পড়েছে। কিন্তু তাতেও একটা মুশকিল আছে, ২৪ ঘণ্টা পার না হলে পুলিশ কাউকে মিসিং পারসন হিসেবে গণ্য করে না।'

রানু আবার বলল, 'কিছুই করা যাবে না?'

মিসির আলি গম্ভীর মুখে সিগারেট টানতে লাগলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন রানুর চোখ-মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে। সে ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছে।

'রানু, তুমি যদি ঐ লোকটির কোনো ঠিকানা কোনোভাবে এনে দিতে পার, তাহলে একটা চেষ্টা চালানো যেতে পারে।'

'ঠিকানা কোথায় পাব?'

'তা তো রানু আমি জানি না। যেভাবে খবরটি পেয়েছ, সেইভাবেই যদি পাও।'

রানু উঠে দাঁড়াল। মিসির আলি সাহেব বললেন, 'যাচ্ছ নাকি?'

'হ্যাঁ, বসে থেকে কী করব?'

নীলুদের সব ক'টি ঘরে আলো জ্বলছে। রাত প্রায় এগারটা বাজে। নীলুর বাবা পাথরের মূর্তির মতো বাগানের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। রানুদের ঢুকতে দেখে এগিয়ে এলেন কিন্তু কিছু বললেন না। রানু মাথা নিচু করে তিনতলায় উঠে গেল। নীলুদের ঘরে ঘনঘন টেলিফোন বাজছে। দুটি গাড়ি এসে থামল। মনে হয় ওঁরা খুঁজতে শুরু করেছেন। পুলিশের কাছে নিশ্চয়ই লোক গিয়েছে। নীলুর বাবা অস্থির ভঙ্গিতে বাগানে হাঁটছেন।

২২

ছোট্ট একটি ঘর। কিন্তু দু শ' পাওয়ারের একটি বাতি জ্বলছে ঘরে। চারদিক ঝলমল করছে। লোকটি একটি চেয়ারে বসে আছে। নীলু লোকটির মুখ দেখতে পাচ্ছে না, কারণ লোকটি বসে আছে তার পেছনে। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাবার কোনো উপায় নেই নীলুর। নাইলনের চিকন দড়ি তার গা কেটে বসে গেছে। চারদিকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। মাঝে-মাঝে দূরের রাস্তা দিয়ে দ্রুতগামী ট্রাকের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। নীলু থেমে-থেমে বলল, 'আপনি কি আমাকে মেরে ফেলবেন?'

কেউ কোনো জবাব দিল না।

'আমি আপনার কোনো ক্ষতি করি নি। কেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন? প্লীজ, আমাকে যেতে দিন। আমি কাউকে কিছু বলব না। কেউ আপনার কথা জানবে না।'

পেছনের চেয়ার একটু নড়ে উঠল। ভারি গলায় লোকটি কথা বলল, 'কেউ জানলেও আমার কিছু যায়-আসে না।'

'কেন আপনি এ রকম করছেন?'

'আমি একজন অসুস্থ মানুষ। মাঝে-মাঝে আমাকে এ রকম করতে হয়।'

'আপনি কি আমাকে মেরে ফেলবেন?'

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। লোকটি হাত বাড়িয়ে বাতি নিভিয়ে দিল। চারদিকে ঘন অন্ধকার। নীলু চাপা স্বরে ডাকল, 'মা, মাগো!'

'চুপ করে থাক, কথা বলবে না।'

'কেন এ রকম করছেন আপনি?'

'আমি একজন অসুস্থ মানুষ। পৃথিবীতে কিছু অসুস্থ মানুষ থাকে।'

'আপনি কি আমার মতো আরো অনেক মেয়েকে এইভাবে ফাঁদ পেতে এনেছেন?'

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। লোকটি এগিয়ে এসে নীলুর গায়ে হাত রাখল। এই কি সেই ভালোবাসার স্পর্শ? নীলু ডাকল, 'মা, মাগো!'

'চুপ করে থাক।'

'আপনি মানুষ, না অন্য কিছু?'

'বেশির ভাগ সময়ই আমি মানুষ থাকি, মাঝে-মাঝে অন্য রকম হয়ে যাই।'

লোকটি শব্দ করে হাসল। কী কুৎসিত হাসি! ঘরে একটুও বাতাস নেই। দম বন্ধ হয়ে আসছে। নীলু প্রাণপণে তার একটা হাত ছুটিয়ে আনতে চেষ্টা করছে। যতই চেষ্টা করছে দড়িগুলো ততই যেন কেটে-কেটে বসে যাচ্ছে।

'কেন, কেন আপনি এরকম করছেন?'

'বলেছি তো নীলু! অনেক বার বললাম তোমাকে। আমি অসুস্থ।'

'কী করবেন আপনি?'

'অন্যদের যা করেছি তা-ই করব।'

'কী করেছেন অন্যদের?'

লোকটি হেসে উঠল। নীলু কাতর স্বরে বলল, 'আপনি দয়া করুন, আমি আপনার পায়ে পড়ি। প্লীজ। আমি আপনার কথা কাউকে বলব না।'

'তা কি হয়?'

'বিশ্বাস করুন। আমি আমার কথা রাখি। কাউকে আমি আপনার কথা বলব না।'

লোকটি ফিরে যাচ্ছে। নীলু কি বেঁচে যাবে? লোকটি কি তাকে ছেড়ে দেবে? নীলু গুছিয়ে চিন্তা করতে পারছে না। সব কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। লোকটি একটি ড্রয়ার খুলল। ঘর অন্ধকার, নীলু কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু সে নিশ্চিত জানে, তার হাতে ধারাল কিছু-একটা আছে। ক্ষুরজাতীয় কিছু। লোকটি সেটি বাঁ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। আসবে, সে এক সময় এগিয়ে আসবে তার কাছে। খুব কাছে কোথাও রিকশার টুনটুন শোনা গেল। নীলু প্রাণপণে চেঁচাল, 'বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও।' কিন্তু গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরুল না।

২৩

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রানুর অবস্থা খারাপ হতে লাগল। বারবার বলতে লাগল–উফ্, বড্ড গরম লাগছে। আনিস সমস্ত দরজা-জানালা খুলে দিল, ফ্যান ছেড়ে দিল, তবু তার গরম কমল না। রানু কাতর স্বরে বলল, 'তুমি আমাকে ধরে থাক, আমার বড্ড ভয় লাগছে।'

'এই তো আমি তোমাকে ধরে আছি। কিসের এত ভয়, রানু?'

'আমার সামনে ঐ লোকটি বসে আছে—আমি স্পষ্ট দেখছি। ওর হাতে একটা ক্ষুর।'

রানু ফোঁপাতে শুরু করল। ওকে ডাক্তারের কাছে নেয়া উচিত। যত তাড়াতাড়ি নেয়া যায় ততই ভালো। আনিস ডাকল, 'জিতু—জিতু মিয়া।' কিন্তু জিতু মিয়ার ঘুম ভাঙল না। রানু বলল, 'তুমি আমাকে একা রেখে কোথাও যেতে পারবে না। আমার বড় ভয় লাগছে।'

'কোনো ভয় নাই রানু।'

'লোকটি ক্ষুর হাতে বসে আছে। তবু তুমি বলছ ভয় নেই?'

'এই সব তোমার কল্পনা। এস, তোমার মাথায় একটু পানি দিই?'

'তুমি কোথাও যেতে পারবে না। ঐ লোকটি এখন উঠে দাঁড়িয়েছে। তুমি আমাকে শক্ত করে ধরে থাক। আরও শক্ত করে ধর।'

আনিস তাকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল। রানু ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'আমি তোমাকে একটি কথা কখনো বলি নি। একবার একজন লোক আমাকে মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিল।'

'রানু, এখন তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। দয়া করে চুপ করে থাক।'

'না, আমি বলতে চাই।'

'সকাল হোক। সকাল হলেই শুনব।'

'মাঝে-মাঝে আমার মনে হয় একজন-কেউ আমার সঙ্গে থাকে।'

'রানু, চুপ করে থাক।'

'না, আমি চুপ করে থাকব না। আমার বলতে ইচ্ছে করছে। যে আমার সঙ্গে থাকে, তার সঙ্গে আমি অনেক বার কথা বলেছি, কিন্তু আজ সে কিছুতেই আসছে না।'

'তার আসার কোনো দরকার নেই।'

'তুমি বুঝতে পারছ না, তার আসার খুব দরকার।'

রাত দেড়টার দিকে নিচ থেকে বিলুর কান্না শোনা যেতে লাগল। অনেক লোকজনের ভিড়। কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। রানু বলল, 'বিলু কাঁদছে। বড় খারাপ লাগছে আমার।'

'রানু, তুমি একটু শুয়ে থাক। আমি জিতুকে ডেকে দিচ্ছি।'

'তুমি কোথায় যাবে?'

'আমি একজন ডাক্তার নিয়ে আসব। আমার মোটেই ভালো লাগছে না।'

'তুমি আমাকে ফেলে রেখে কোথাও যেতে পারবে না।'

রানুর কথা জড়িয়ে যেতে লাগল। এক সময় বিছানায় নেতিয়ে পড়ল। আনিস ছুটে গেল ডাক্তার আনতে। বড় রাস্তার মোড়ে একজন ডাক্তারের বাসা আছে। ডাক্তার সাহেবকে পাওয়া গেল না। আনিস ফিরে এসে ঘরে ঢোকবার মুখেই তীব্র ফুলের গন্ধ পেল। ঘরের বাতি নেভানো। কে নিভিয়েছে বাতি? আনিস ঢুকতেই রানু বলল, 'ও এসেছে।'

'কে? কে এসেছে?'

'তুমি গন্ধ পাচ্ছ না?'

আনিস এগিয়ে এসে রানুর হাত ধরল। গা ভীষণ গরম। রানু বলল, 'ও নীলুর কাছে যাবে।'

'রানু, শুয়ে থাক।'

'উঁহু, শোব কীভাবে? ও একা যেতে ভয় পাচ্ছে। আমিও যাব ওর সঙ্গে। ও আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।'

বলতে বলতে রানু খিলখিল করে হাসল।

আনিস বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকল, 'রহমান সাহেব, রহমান সাহেব। ভাই, একটু আসুন, আমার বড় বিপদ।'

রহমান সাহেব ঘরে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী বেরিয়ে এলেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'কী হয়েছে?'

'আপনি একটু আসুন, আমার স্ত্রী কেমন যেন করছে।'

ভদ্রমহিলা সঙ্গে-সঙ্গে এলেন। এবং ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে বললেন, 'নূপুরের শব্দ না?' রানু কিশোরী মেয়ের গলায় খিলখিল করে হাসল।

'কী হয়েছে ওনার?'

'আপনি একটু বসুন ওর পাশে। আমি ডাক্তার নিয়ে আসি।'

আনিস ছুটে বেরিয়ে গেল। ফুলের সৌরভ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। রানু হাসিমুখে বলল, 'আমার সময় বেশি নেই, ঐ লোকটি এগিয়ে আসছে।'

'কোন লোক?'

'আপনি চিনবেন না। না-চেনাই ভালো।'

ভদ্রমহিলা রানুর হাত ধরলেন। উত্তাপে গা পুড়ে যাচ্ছে। তিনি কী করবেন ভেবে পেলেন না।

আনিস ডাক্তার নিয়ে ফেরার আগেই রানু মারা গেল।

২৪

ঘর অন্ধকার, কিন্তু চোখে অন্ধকার সয়ে আসছে। আবছামতো সব কিছু দেখা যায়। বাড়িটা কোথায়? শহর থেকে অনেক দূরে কি? কোনো শব্দ নেই। কত রাত এখন? বাড়িতে এখন ওরা কী করছে? বিলু কি ঘুমিয়েছি মশারি ফেলে? না, না– আজ কেউ ঘুমায় নি, আজ সবাই ছোটাছুটি করছে। সবাই খুঁজছে নীলুকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো পুলিশের গাড়ির শব্দ শোনা যাবে। বাবা এসে বলবেন—কোনো ভয় নেই মা-মণি।

চেয়ার নড়ার শব্দ হলো। লোকটি কি উঠে দাঁড়িয়েছে? তার হাতে ওটা কী? নীলু মনে-মনে বলল, 'বাবা, আমি একজন অসুস্থ লোকের হাতে আটকা পড়েছি, আমাকে তোমরা বাঁচাও। আমার আর মোটেও সময় নেই বাবা। তোমাদের খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

লোকটি এগিয়ে আসছে। পেছন থেকে সে খুব ধীর গতিতে এগিয়ে এল সামনে। এখন নীলু আবছাভাবে লোকটির মুখ দেখতে পাচ্ছে। কী সুন্দর একটি মুখ! নীলু বিড়বিড় করে বলল, 'প্লীজ, দয়া করুন।' লোকটি অদ্ভুত শব্দ করল। এটি কি হাসির শব্দ? নীলুর গা গোলাচ্ছে। নীলু চিৎ হয়ে থাকা অবস্থাতেই মুখ ভর্তি করে বমি করল। দুঃস্বপ্ন, সমস্তটাই একটা দুঃস্বপ্ন। এক্ষুণি ঘুম ভেঙে যাবে। আর নীলু দেখবে—বিলু বাতি জ্বালিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার বুকের ওপর একটা গল্পের বই। এখানে যা ঘটছে, তা সত্যি হতেই পারে না!

লোকটি তার পাশে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল। নীলু চাপা গলায় বলল, 'আমার গায়ে হাত দেবেন না, প্লীজ।' লোকটি হেসে উঠছে শব্দ করে। আর ঠিক তখনই নূপুরের শব্দ শোনা গেল। যেন কেউ-একজন এসে ঢুকেছে এ ঘরে।

লোকটি ভারি গলায় বলল, 'কে, কে ওখানে?' তার উত্তরে অল্পবয়সী একটি

মেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। লোকটি চেঁচাল, 'কে, কে?' কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। শুধু ঘরের শেষ প্রান্তের একটা জানালা খুলে ভয়ানক শীতল একটা হাওয়া এসে ঢুকল ঘরে। সে হাওয়ায় ভেসে এল অদ্ভুত মিষ্টি একটা গন্ধ।

নীলুর মনে হলো একটি মেয়ে যেন নূপুর পায়ে দিয়ে তার চারপাশ দিয়ে ঘুরতে শুরু করেছে। ঘুরতে-ঘুরতে এক বার মেয়েটি তাকে স্পর্শ করল, আর তক্ষুণি নীলুর মনে হলো– আর কোনো ভয় নেই।

নীলু দেখল, লোকটি ক্রমেই দেয়ালের দিকে সরে যাচ্ছে। এক বার সে চাপা স্বরে বলল, 'তুমি কে?' মিষ্টি একটি হাসি শোনা গেল তখন। ফুলের গন্ধ আরো তীব্র হলো। অন্য কোনো ভুবন থেকে ভেসে এল নূপুরের ধ্বনি। লোকটি গা ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'এসব কী হচ্ছে! কে, এখানে কে?' কেউ তার কথার জবাব দিল না। একটি দুষ্টু মেয়ে শুধু হাসতে লাগল। ভীষণ দুষ্টু একটি মেয়ে। তার পায়ে নূপুর। তার গায়ে অপার্থিব এক ফুলের গন্ধ। মেয়েটি এবার দুইহাত বাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে লোকটির দিকে। লোকটির কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল, 'এইসব কী? কে, কে?' তার উত্তরে সমস্ত ঘরময় মিষ্টি খিলখিল হাসি ঝমঝম করতে লাগল। লোকটি চাপা গলায় বলে উঠল, 'আমাকে বাঁচাও। বাঁচাও।' দুষ্টু মেয়েটি আবার হাসল, যেন খুব একটা মজার কথা।

পরিশিষ্ট

থার্ড ইয়ার অনার্সের এই ক্লাসটি মিসির আলি সাহেবকে দেয়া হয়েছে। সাইকোলজি ফিফ্‌থ পেপার। মিসির আলি হাসিমুখে ক্লাসে ঢুকলেন। তাঁর মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। রানু বসে আছে সেকেন্ড বেঞ্চে। তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। তিনি মেয়েটির দিকে তাকালেন এবং তাকিয়ে রইলেন। মনে হলো, মেয়েটির ঠোঁটের কোণায় হাসি লেগে আছে। মিসির আলি কাঁপা গলায় বললেন, 'তোমার নাম কি?'

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। স্পষ্ট স্বরে বলল, 'আমার নাম নীলু। নীলুফার। রোল নাম্বার থার্টি টু।'

'আমি একটি মেয়েকে চিনতাম। তুমি দেখতে অবিকল তার মতো।'

নীলুফার শান্ত স্বরে বলল, 'আমি জানি।'

মিসির আলি সাহেব কপালের ঘাম মুছলেন। সমস্ত ব্যাপারটি ভুলে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে-করতে বললেন, 'আমি তোমাদের পড়াব ফিফ্‌থ্ পেপার। খুব ইন্টারেস্টিং একটি টপিক—'

রানুর মতো দেখতে মেয়েটি তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। মেয়েটির মুখে মৃদু হাসি।